স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

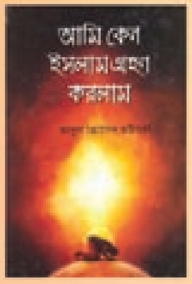

এক
দেশদ্রোহীর
জবানবন্দী
পৃষ্ঠা - ৩০

বেশিরভাগ
মানুষের
কর্মসংস্থানই
মূল লক্ষ্য :
প্রধানমন্ত্রী মোদী
পৃষ্ঠা - ২৭

৬৭ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ১৫ জুন ২০১৫।। ৩১ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

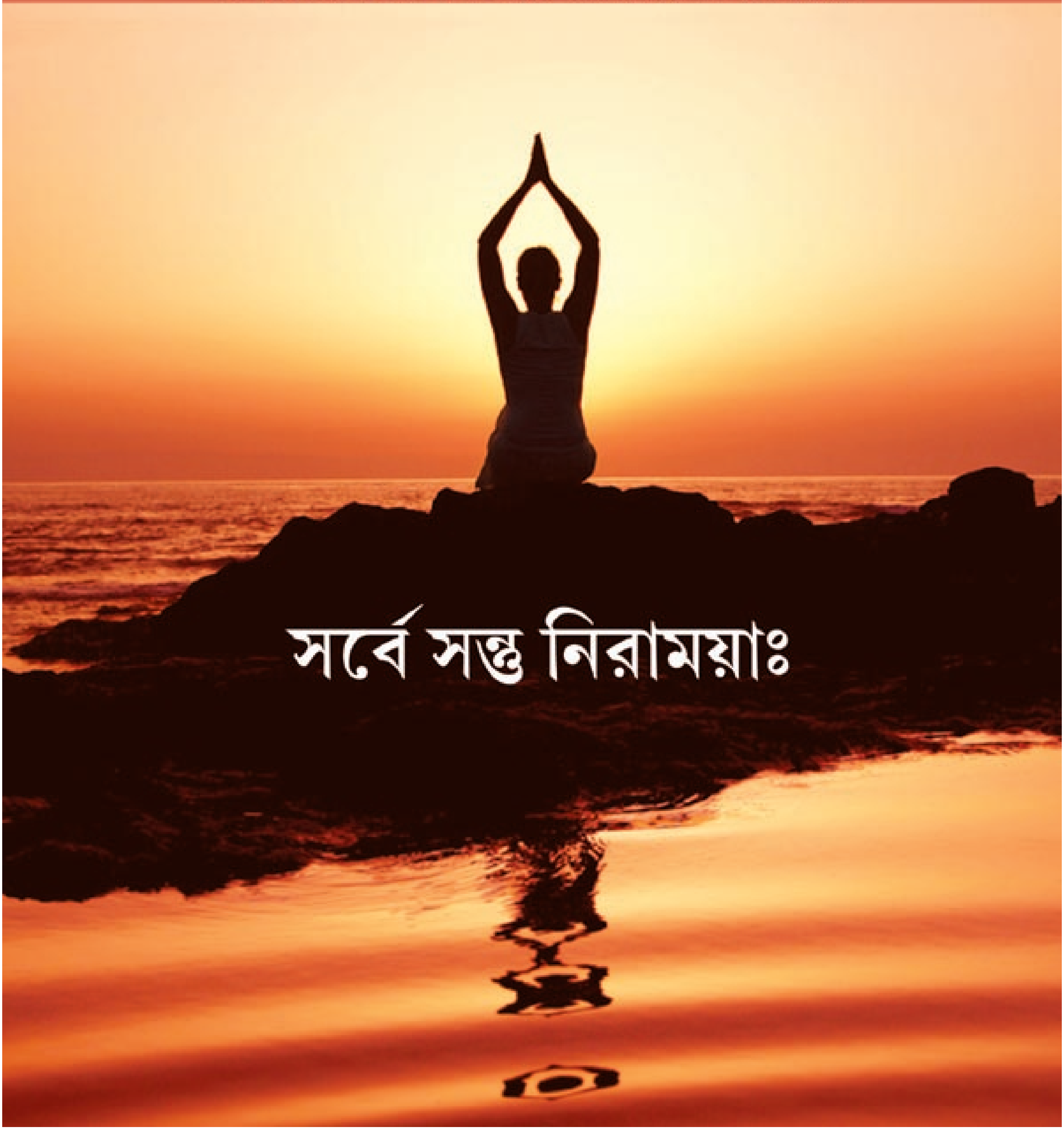

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১৫ জুন - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯
দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতি ঘটলেই কি বাংলাদেশে হিন্দু নিধন বন্ধ হবে? □ গূঢ়পুরুষ □ ১০
খোলা চিঠি : বঙ্গে এলেন রাহুল, সঙ্গে এল কপাল □ সুন্দর মৌলিক □ ১১
বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ সচেতন দিবসের ভাবনা □ এন সি দে □ ১২
রোগে যোগ □ যোগাচার্য ড. প্রেমসুন্দর দাস □ ১৪
যোগময় জীবনে অষ্টাঙ্গ যোগের উপযোগিতা □ মহামায়া রায় □ ১৬
সত্যিকারের যোগীর লক্ষণ □ ডা: নীরেন মজুমদার □ ১৭
একশো দিনের কাজ □ মনতোষ বসু □ ২০
পৌরাণিক নগর পাণ্ড্য □ গোপাল চক্রবর্তী □ ২১
আনুড়ের বিশালাক্ষ্মী বাংলার কামাখ্যা □ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল □ ২২
সাক্ষাৎকার : বেশিরভাগ মানুষের কর্মসংস্থান কীভাবে হওয়া সম্ভব এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী □ ২৭
এক দেশদ্রোহীর জবানবন্দী □ শশাঙ্ক ভূষণ মিত্র □ ৩০
আমার 'মা' □ সাধনা দে □ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □
সুস্বাস্থ্য : ৩৫-৩৬ □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮** □
শব্দরূপ : ৪০ □ **চিত্রকথা : ৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রধানমন্ত্রী মোদীর বাংলাদেশ সফর ও দু'দেশের সম্পর্ক

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর করে এলেন। ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল বিনিময় অর্থাৎ স্থলসীমা বিনিময় চুক্তি ছিল এই সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সফর ও চুক্তি কি প্রকৃতই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে স্বাভাবিক করতে পারবে? তিনবিঘা করিডর কি সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাঁটা হয়ে রইলো না? এই বিষয় নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ। লিখেছেন মোহিত রায়, সাধন পাল, অম্লানকুসুম ঘোষ প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

‘নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্’

আজ সকলেই অবগত হইয়াছেন আগামী ২১ জুন তারিখটি বিশ্ব যোগদিবস হিসেবে সমগ্র বিশ্বে পালিত হইবে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরম্পরার প্রাচীনতম সোপান হইল যোগসাধনা। বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋকবেদে যে সাধনার সূত্রপাত, কঠোপনিষদে তাহার ব্যাপ্তি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রহিয়াছে যোগের পূর্ণ বিবরণ। পতঞ্জলি এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই যোগ দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় যোগাভ্যাস নানা বৈচিত্র্যে উপস্থাপিত। যোগ শব্দের অর্থ সংসারে উত্তীর্ণ হইবার উপায় অর্থাৎ জীবনচর্চার প্রেরণা। মানুষের সৎ, শুদ্ধ, পরিপূর্ণ জীবন দর্শনই যোগ। পাতঞ্জল যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তি নিরোধকে যোগ বলা হইয়াছে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ অর্থে কোনো এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা যা বর্তমান মানুষের জীবনে সাফল্যলাভের মূল উপায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকে যোগ বলিলেও স্বামী বিবেকানন্দ কর্মযোগকে সবার উপরে স্থান দিয়াছেন। যোগদর্শনের ব্রহ্মবাদই একালের মানবতা। দর্শনের ‘তৎ ত্বম্ অসি’ তত্ত্বের মধ্যে তৎ ‘ত্বমে’র সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়াছে। পরানুবাদ ও পরাণুকরণের ফলে আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম আমাদের এই গৌরবজ্জ্বল পরম্পরা। আমাদের আত্মজ্ঞানের অভাব সকল দুঃখ দুরবস্থার মূলে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের পদতলে পিষ্ট হইয়া, তাহার পর ধর্মনিরপেক্ষতার কূটকৌশলে গ্রস্ত হইয়া আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম এই আত্মজ্ঞান। স্বাধীনতার এতবছর পরেও এই আত্মবিশ্বাস আমরা উদ্ধার করিতে পারি নাই, স্বাধীনতা অর্জনের আভিজাত্যে আজও মাথা উঁচু সম্রাটের মতন স্বভূমিতে দাঁড়াইতে পারি নাই। অথচ এতদিনে অন্ততঃ দাঁড়াইয়া উঠিবার কথা ছিল। অন্তত স্বামীজী জাতির কাছে তাই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। আত্মজ্ঞানের অভাবেই আমাদের রক্তে সংক্রমিত হইয়াছে এই জঘন্য হীনমন্যতা ও আত্মাবমাননার এই কাল ব্যাধি। মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষার এই হইল বিষময় পরিণাম। এ সম্পর্কে স্বামীজী এবং তাঁহার গুরু উভয়েই তাঁহাদের স্বজাতিকে সতর্ক করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু আমরা শুনিনি গুরু-শিষ্য কাহারো উপদেশ শুনি নাই। আজ এই ভুল সংশোধন করিবার সময় উপস্থিত। চিরকাল ভারতবর্ষ ‘নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্’, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাবকে অবলম্বন করিয়াই বিশ্বকে পথ দেখাইয়াছে। যুদ্ধবিদ্যায় আমরা পথপ্রদর্শক হইতে পারি নাই। চেষ্টাও করি নাই। অর্থনীতিতেও আমরা পারদর্শী নই। একমাত্র আধ্যাত্মিক পথেই আমরা বিশ্বগুরু হইতে পারিব। কয়েকদশক ধরিয়া আমরা অর্থনীতির পূজারি হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমরা মনে করিয়াছিলাম অর্থনীতিতে আমরা সুপার পাওয়ার হইয়া উঠিব। কিন্তু আমাদের সাধনা মোক্ষের। ভারতীয় শাস্ত্র অর্থকে অস্বীকার করে না তবু মোক্ষের সন্ধানেই আমাদের সমগ্র জীবনের অনুসন্ধিৎসা।

নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া বিবেকানন্দ অনুগামী আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এই সত্যটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জীবন সাধনার মূল ভাবটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে তাই তিনি সচেষ্ট হইয়াছেন। বস্তুত তাঁহার অনুরোধেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ যোগ দিবসকে স্বীকৃতি দিয়াছেন।

সুভাষিতম্

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।। (গীতা ৬/১৯)

ঝঞ্ঝাবিহীন স্থানে দীপশিখা স্থির থাকে। যে যোগী চিত্ত স্থির ও সংযত করে যোগযুক্ত হন, তাঁকে সেই দীপাশিখার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

চল্লিশ বছরে সিকিমের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সিকিম ভারতের ২২তম রাজ্য হিসেবে ১৯৭৫ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই চল্লিশ বছরে উন্নয়নে সিকিম এক বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জৈব কৃষির প্রচলনে শুধু ভারত নয়, এশিয়ার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য সমআয়তন রাজ্যের তুলনায় সিকিমের জিডিপি-র হার প্রায় ৫ শতাংশ বেশি। সিকিমের এই উন্নয়নের সূত্রপাত হয় মূলত ১৯৯৪ সাল থেকে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পবনকুমার চামলিং ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক ক্ষেত্রে সিকিমের সাফল্য আসতে থাকে।

১৯৯৪ সালে সিকিমে দারিদ্র্য হার ছিল প্রায় ৪১ শতাংশ। দেশের দরিদ্রতম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম। সেই তুলনায় গোয়া, কেরল ও হিমাচলের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। ২০০৪-০৫ সালের পর থেকে তা কমতে থাকে। ২০০৪-০৫ সালে সেখানে দারিদ্র্য হার ছিল ৩০.৯ শতাংশ। ২০১১-১২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৪.২ শতাংশ।

সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে সিকিম। ২০০১ সালে সাক্ষরতার হার ৬৮.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮২.২ শতাংশ। যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর মধ্যে পুরুষের হার ৮৬.৬ শতাংশ এবং মহিলাদের ৬৬.৪ শতাংশ। এছাড়াও সিকিমের গ্রামীণ সাক্ষরতার হার জাতীয় ক্ষেত্রকেও ছাড়িয়ে গেছে। সে সময় ভারতের গ্রামীণ সাক্ষরতার হার ছিল ৬৮.৭ শতাংশ। সিকিম এই হারকে ছাড়িয়ে ৭৯.৪ শতাংশে পৌঁছয়। সাক্ষরতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে বর্তমান সরকার সিকিমে ১০০ শতাংশ সাক্ষরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে।

২০০৩ সালে সিকিম সরকার রাজ্যকে পুরোপুরি জৈব কৃষি প্রচলনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল। সেজন্য নিষিদ্ধ করা হয় রাসায়নিক সারের ব্যবহার। সিকিমের ষাট হাজার হেক্টর কৃষি জমির মধ্যে ৪০ শতাংশই জৈব কৃষিভূমি। গোটা দেশের একটা বৃহৎ অংশ এখনও খোলা জায়গায় শৌচকর্ম করে। কিন্তু সিকিম ২০০৪ সালেই প্রতিটি বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। ভারতের মধ্যে সিকিমই প্রথম ১০০ শতাংশ শৌচালয় নির্মাণে সফল হয়েছে বলে ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিকিমের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

২০১৪ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিপোর্টে সিকিম মানবসম্পদ বিকাশে সবচেয়ে বেশি কার্যকরি ভূমিকা নিয়েছে বলে উল্লেখ করে। ভারতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি লিসে গ্র্যান্ডে বলেন, একইরকম পরিস্থিতিতে থেকেও ভারতের আর কোনো রাজ্য এত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। উল্লেখ্য, ছোট রাজ্য হিসেবে গত দশ বছরে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি ভারত তো বটেই, গোটা এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ।

আয়তনে সিকিম ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে কম। এরকম একটি কাজের বিস্ময়কর সাফল্য বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। বিভিন্ন মহলের মত, সিকিমের এই সাফল্যে শুধু রাজনৈতিক কারণেই নয়। বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী ও সামাজিক সংগঠনের একটা প্রভাব এখানে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। পবন কুমার চামলিং মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই ধরনের সংগঠনগুলিকে সামাজিক কাজ করার জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন।

কালো টাকার মুক্তাঞ্চলগুলি তথ্য সরবরাহ করতে ক্রমশ আগ্রহ দেখাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নানান পরিচিত দেশ ছাড়াও বৃটিশ ভারজিন আইল্যান্ড, সাইপ্রাস বা জারসির মতো কর ফাঁকি দিয়ে কালো টাকা লুকিয়ে রাখার ছোট ছোট নিরাপদ আবাসগুলি সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে তথ্য আদান প্রদানে তৎপরতা দেখাচ্ছে। সরকারি সূত্র অনুযায়ী কালো টাকার জিম্মাদার এই আখড়াগুলির তথ্য উন্মোচনের ফলে ভারত সরকারের বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা উদ্ধারের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট গতি সঞ্চার হবে।

পরিস্থিতির এই ইতিবাচক পরিবর্তন ঠিক সুইস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের ৭ জন ভারতীয়ের কর ফাঁকি দেওয়া অর্থের হদিস দেওয়ার পরে পরেই ঘটছে। ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষে প্রস্তাবিত 'কমপ্লায়ান্স প্রস্তাব' অনুযায়ী বিদেশে রাখা অঘোষিত টাকার মালিকদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে যাতে তারা সরকারের ঘোষিত প্রস্তাব মেনে নেয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কর ফাঁকি দেওয়া ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় একবারই মাত্র সুযোগ পাবেন তাঁর অঘোষিত টাকার ডেরা বা গচ্ছিত দেশের নাম, অ্যাকাউন্ট নাম্বার, টাকার পরিমাণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করার।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, আসন্ন নতুন আইনে যে কঠিন ধারা রাখা হচ্ছে তার পরিণতিতে কর সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য গোপন করা বা আয়ের সঠিক ঘোষণা না করলে ১০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। ভবিষ্যতের এই আশঙ্কায় অনেকেই সরকারের বর্তমানে প্রস্তাবিত এককালীন ছাড় সম্পর্কে প্রবল উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। এখনও পর্যন্ত সরকারি প্রস্তাবটির খসড়া নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। প্রস্তাবের আইনি দিকগুলি পরিষ্কার হয়ে গেলেই এক বিপুল সংখ্যক কালোটাকার মালিক যে এই সুবিধে নিতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন সে বিষয়ে দপ্তরের কর্তারা আশা ব্যক্ত করেছেন।

দপ্তর কর্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী প্রস্তাবিত 'সম্মতি প্রস্তাবটি'র বাস্তব প্রয়োগ যাতে কোনো কালো টাকার মালিকের ওপর অন্যায় দাবি চাপানো না হয় বা কাউকে 'বলির পাঁঠা' না করা হয় সে বিষয়ে দপ্তর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে।

ভারতীয় ভাষাগুলিকে স্বমহিমায় ফেরানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যাবতীয় আইনি, বিচারবিভাগীয়, অর্থনৈতিক ও সরকারি বিনিময় সংক্রান্ত কাজ ইংরেজি-র পরিবর্তে ভারতীয় ভাষায় করার দাবি তুলল শিক্ষা-সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস। ন্যাসের দাবি দেশের মানুষের সহজবোধ্যতার কথা মাথায় রেখেই এব্যাপারে সরকারের প্রয়াসী হওয়া উচিত। একইসঙ্গে স্কুলে স্কুলে বৈদিক গণিতকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও তুলেছে তারা। প্রসঙ্গত,বর্তমানে জেলা আদালতগুলিতে আবেদন, শুনানি, এমনকী বিচারের রায় পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষাতেই দেওয়া হয়। কিন্তু দেশের অধিকাংশ উচ্চ আদালত এবং সর্বোচ্চ আদালত এখনও ইংরেজি ভাষাতেই তাদের কাজকর্মের অবস্থান অনড় রেখেছে। ন্যাসের সাধারণ সম্পাদক অতুল কোঠারী বলেছেন : 'ভারতীয় ভাষাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।' জুলাইয়ের অন্তিম সপ্তাহে এর্নাকুলামে ন্যাসের যে তিন দিনের সম্মেলন হয়ে গেল তাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলি প্রধানমন্ত্রীর হাতে হস্তান্তর করা হবে বলে নয়াদিল্লীতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী কোঠারী জানিয়েছেন।

ন্যাসের বক্তব্য, উচ্চ আদালতে যেভাবে ইংরেজির বিপুল ব্যবহার হয় তাতে এই ভাষায় অনভিজ্ঞ বিচারপ্রার্থীর পক্ষে রায়ের অর্থ উদ্ধার করা অনেক সময়ই সমস্যা-সঙ্কুল হয়। তাই বিভিন্ন জেলা আদালতে যেমন রাজ্যের সরকারি ভাষা ব্যবহৃত হয়, তেমনি উচ্চ আদালতেও ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দিতেও কাজকর্ম হওয়া উচিত বলে কোঠারী আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যই তার মাতৃভাষাতে হওয়া উচিত। ইংরেজিকে পরের দিকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতেই পারে, তবে পাঠ্যসূচি হিসেবে, পড়ানোর মাধ্যম হিসেবে নয়।

ভাষাবিদ উমকার এন কৌল-এ প্রসঙ্গে বলেন যে সুপ্রিম কোর্ট গত বছর রায় দিয়েছে যে অভিভাবক কিংবা সরকার কেউই শিশুর ভাষাগত পছন্দ ঠিক করার একক অধিকারী নয়। কৌল এক্ষেত্রে ন্যাসের দাবির সঙ্গে সহমত। তাঁর বক্তব্য : 'একটি ভাষার অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়ন তখনই সম্ভব যদি তা শিক্ষায়, সংবাদমাধ্যমে ও প্রশাসনে ভালোভাবে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে রাজ্যের দায়িত্বও কম নয়।' ইংরেজির সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় তার অনুদিত কপিও এখানে সমস্যা কমাতে পারে বলে তাঁর অভিমত।

ন্যাস প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য বৈদিক গণিতের সিলেবাসের একটি খসড়া প্রস্তুত করেছে। অতুল কোঠারীর বক্তব্য : 'সমস্ত গাণিতিক অঙ্ক বৈদিক গণিতের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি মেলে।' এই সিলেবাস চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া ও উত্তরপ্রদেশের মীরাটের কিছু বেসরকারি স্কুলে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে ন্যাসের। এন সি ই আর টি যখন অতি সম্প্রতি স্কুলের নতুন শিক্ষাসূচি তৈরি করবে তখন বৈদিক গণিতের

অতুল কোঠারী

ব্যাপারটি বিবেচনায় আনার জন্যে ন্যাসের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হবে। প্রসঙ্গত, শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস বৈদিক গণিতের যে ছ' মাসের শংসাপত্র কোর্সের পরিকল্পনা করেছে তা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে ভূপালের অটলবিহারী বাজপেয়ী হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় ও নাগপুরের কালিদাস সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই মরসুম থেকে তা পাঞ্জাব কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়েও শুরু হবে।

ন্যাসের দাবি

- সমস্ত আইনি/বিচারবিভাগীয়, সরকারি, অর্থনৈতিক (ব্যাঙ্কিং, বিমা) কাজ ইংরেজি ছাড়া ভারতীয় স্থানীয় ভাষায় করতে হবে।
- সমস্ত উচ্চতর শিক্ষা-প্রবেশিকা ও চাকরির পরীক্ষাও ইংরেজি ব্যতীত রাজ্যের সরকারি ভাষায় (জাতীয় স্তরে হিন্দিতে) নিতে হবে।
- উৎপাদনের তথ্য ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাষাতেও দিতে হবে।
- সংবাদমাধ্যম, তথ্য-প্রযুক্তিতে ভারতীয় ভাষায় গুরুত্ব।
- ভারতীয় ভাষায় এস এম এস করলে তা সস্তা হওয়া উচিত।
- সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ইন্টারভিউ ভারতীয় ভাষায় হওয়া দরকার।

সবার প্রিয়
®
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

ভারতের সুখবর সম্প্রচারে দূরদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কুকুর মানুষকে কামড়ালে সেটা খবর? নাকি মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা খবর? প্রথমটা অবশ্যই নয়, কারণ সেটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এক্ষেত্রে খবর অবশ্যই দ্বিতীয়টি। যেহেতু বিষয়টা ব্যতিক্রমী। সাংবাদিকতার এই আধুনিক পাঠ-কে বদলে দিতে উদ্যোগী হলো দূরদর্শন। গত ৩১ মে থেকে দূরদর্শনে 'গুড নিউজ ইন্ডিয়া' নামে একটি আধঘণ্টার সাপ্তাহিক প্রদর্শন শুরু হয়েছে। এই প্রদর্শনটির উদ্দেশ্য 'সারা ভারত জুড়ে মানুষের সঙ্গে যে ইতিবাচক, উৎসাহব্যাঞ্জক এবং সাফল্যসূচক খবর জড়িয়ে রয়েছে তা সম্প্রচার করা।' বর্তমানে নেতিবাচক খবর প্রচার করা দেশের একশ্রেণীর সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন চ্যানেলের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সমাজের অবিচার, অনাচার, অত্যাচার যেমন তুলে ধরা তার কর্তব্য, তেমনই সামাজিক গুণাবলীর কথা প্রচার করাও তার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। যদিও নিজেদের শ্রীবৃদ্ধির কথা ভাবতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশই সাংবাদিকতার এই আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দূরদর্শনের 'গুড নিউজ ইন্ডিয়া' কার্যক্রম একদিকে যেমন দেশের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নেবে, তেমনি অন্যদিকে সাংবাদিকতার আদর্শও সুপ্রতিষ্ঠিত করবে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। অন্যদিকে, জুনের শেষ থেকে সংস্কৃতে সাপ্তাহিক সংবাদ বুলেটিন সম্প্রচারের ভাবনাও রয়েছে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের মাথায়। 'বার্তাবলী' নামে ওই ৩০ মিনিটের বুলেটিন প্রতিবেদন আলোচনা, ধারাভাষ্য ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হচ্ছে বলে প্রসার ভারতী সূত্রে খবর। সংস্কৃত ভাষায় সংবাদ-সম্প্রচার করে ভারতের ভাষাগত ঐতিহ্যের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছে দূরদর্শন।

আবার জেহাদি আক্রমণ বর্ধমানের সমুদ্রগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ফের জেহাদি আক্রমণে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বর্ধমানের সমুদ্রগড়। এবারও তাদের লক্ষ্য ছিল সেখানকার হিন্দুরা। গত ৪ জুন ঘটনাটি ঘটে সমুদ্রগড় রেল স্টেশন চত্বরে। এদিন সন্ধ্যে নাগাদ কয়েক হাজার মুসলমান দুষ্কৃতী অতর্কিত আক্রমণ চালায় স্টেশন সংলগ্ন বাজার ও বাড়িতে। লুঠপাট করা হয় ৫০টি দোকানে, তারপর তাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। দুষ্কৃতীদের একতরফা আক্রমণে আহত কয়েকজন হিন্দুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবরে প্রকাশ, গত৭ জুন একজনের মৃত্যু হয়। ঘটনার সূত্রপাত হয় একটি হোটেলে মদের দাম মেটানো নিয়ে। ঘটনার দিন দুপুর ১টা নাগাদ কয়েকজন মুসলমান যুবক মা গঙ্গা রোডের একটি হোটেলে মদ খেতে আসে। কিন্তু খাওয়ার পর দাম দিতে অস্বীকার করায় দোকানের মালিকের সঙ্গে তাদের বচসা বাঁধে। তারপর স্থানীয়দের উদ্যোগে তা মিটেও যায়। কিন্তু সন্ধে নাগাদ কয়েক হাজার মুসলমান দুষ্কৃতী অতর্কিত আক্রমণ চালায়। সেই বাজারে অবাধে লুঠপাট করার পর দোকানগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৫০টি দোকান ও ২০টি হিন্দু বাড়ি। স্টেশন লাগোয়া গ্যারেজ থেকে তুলে নিয়ে যায় অনেক সাইকেল ও মোটরবাইক। তারপর তাতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

তাদের আক্রমণ থেকে বাদ যায়নি সমুদ্রগড় রেল স্টেশনও। সেখানেও ভাঙচুর চালায়। মুসলমান দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করে পুলিশের গাড়িতেও। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোটা ঘটনাতে প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয় পুলিশ। সেদিন পর্যন্ত কোনো দুষ্কৃতীকে তারা গ্রেপ্তার করতে পারেনি। উল্টে ১০-১২ জন নিরপরাধ হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের এই আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে স্থানীয় হিন্দুরা। সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে তাদের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে।

সোনারপুরে জেহাদি হামলা

সংবাদদাতা॥ সোনারপুরের উপকণ্ঠে মকরমপুরের বিশাল মাদ্রাসা থেকে জেহাদি দুষ্কৃতীরা আতঙ্ক ছড়িয়ে কখনও হিন্দুর জমি দখল নেয়, কখনও হিন্দু মন্দিরের বিগ্রহের অসম্মান করে, কখনও বা সোনারপুর পেরিয়ে তেমাথা থেকে ক্ষীরিশতলার মধ্যে খাসজমি দখল করে। এমনকী মন্দির সংলগ্ন খাসজমিও দখল করে নেয় ওই দুষ্কৃতীরা। এই খাসজমিতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বসানোর পরিকল্পনা অনেকদিন ধরে চলছে বলেও স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ। যেহেতু হিন্দু মন্দিরে সংলগ্ন জমি সেহেতু হিন্দুরা বাধা দেয়, তাই প্রায় মাসখানেক ধরে উত্তেজনা চলছিল।

গত ২ জুন ক্ষীরিশতলার খেলার মাঠে বসে গ্রামের কিছু হিন্দু যুবক গল্পগুজব করছিল। তখন মাঠে বসে থাকা ওই হিন্দু যুবকদের উপর শ' খানেক মুসলমান যুবক হামলা চালায়। তারা বলতে থাকে হিন্দু সংগঠন করার মজা দেখতে পাবি। এখানে আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজ করা যাবে না।

দুষ্কৃতীদের আঘাতে আহত সমীর নস্কর নামে এক যুবককে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এর প্রতিবাদে পরে হিন্দুরা এখানে এসে জমা হয়। প্রতিবাদ শুরু হলে সোনারপুর থানার আই সি ও পরে এসডিপিও-র নির্দেশে র‍্যাফ নামিয়ে শান্ত হিন্দু জনতার উপর নির্মম ভাবে লাঠি চালানো হয়। অনেকে আহত হয় এবং অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়। অভিযোগ, পুলিশ হিন্দুদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে। ১৮টি বাইক তুলে নিয়ে যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, হিন্দুরা দীর্ঘদিন ধরে থানায় কিছু জেহাদির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছিল। পুলিশ তাতে কর্ণপাত করেনি। গত ২ জুনের ঘটনায় হিন্দুদের গ্রেপ্তার করলেও পুলিশ কিন্তু অভিযুক্ত একজন জেহাদিকেও গ্রেপ্তার করেনি। আর এস এসের সোনারপুর মহকুমা ব্যবস্থাপক মানিকলাল ভৌমিক-সহ আরও চারজন গ্রেপ্তার হন।

সংবাদ প্রতিবেদন

পন্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিকরণের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রাক্তন উপাচার্য ড. জে. কে. তারিন পন্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ইসলামিকরণের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইন্ডিয়া ফ্যাক্টসের কাছে এমন কিছু প্রমাণপত্র ও প্রতিবেদন আছে বলে দাবি করা হয়েছে। যার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ড. তারিন ২০07 এর ১৬ মার্চ থেকে ২০১৩ এর ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যখন পন্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে আসীন ছিলেন, তখন কিভাবে নিয়মানুগভাবে ধীরে ধীরে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ইসলামিকরণ করার পথে হেঁটেছিলেন। এছাড়াও পন্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ, ছাত্রগণ, প্রাক্তন ছাত্রগণ এই ব্যাপারটি সমর্থন করে ইন্ডিয়া ফ্যাক্টসকে জানিয়েছেন যে এই ইসলামিকরণ পরিকল্পিত ব্যাপার বলেই তাদের ধারণা।

২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নজিরহীনভাবে মুসলমান অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়েছিল। দেখা গেছে যে, নিয়োগ পদ্ধতি এমনভাবে পরিচালিত হয়েছিল যে প্রায় সমস্ত বিভাগের ক্ষেত্রেই দরখাস্তকারীরা ছিল মুসলমান এবং এটা নিশ্চিত করা হয়েছিল যে অন্তত একজন মুসলমান চাকরিপ্রার্থী যেন স্ক্রিনিং কমিটির দ্বারা নির্বাচিত হন। যদি কোনো আপত্তি উঠত, তবে সেক্ষেত্রে উপাচার্য ড. তারিন তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতেন। বিগত তিন বছরের সময়কালে ১৯ জন মুসলমান অধ্যাপক এবং একজন মুসলমান সহযোগী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছেন এবং এছাড়াও পণ্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে আরও বহু মুসলমান বিভিন্ন পদে যোগ দিয়েছেন। বিগত তিন বছরে মুসলমান অধ্যাপকের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে ৪ থেকে বেড়ে ২৪ হয়েছে।

বিশেষত জম্মু ও কাশ্মীর থেকে আগত ছাত্রের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল এবং এটা আরও বেশি ভালো করে দৃশ্যমান হয়েছিল এম. ফিল., পি. এইচডি করতে আসা ছাত্রদের ক্ষেত্রে। এটাও লক্ষ্য করার মতো বিষয় যে, উভয় প্রোগ্রামের (অনুক্রম) ক্ষেত্রেও একই প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রযোজ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক কর্মী ইন্ডিয়া ফ্যাক্টসকে বলেছেন যে, তারা সন্দেহ করছেন এই ব্যবস্থা সুচিন্তিতভাবেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার একটা ইঙ্গিত হতে পারে।

অ্যাডমিশন কমিটিও খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল বিশেষ বিশেষ পরীক্ষাকেন্দ্র যেমন শ্রীনগর থেকে আগত ছাত্রের সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছিল এবং বেশ বড় সংখ্যক মুসলমান ছাত্ররাই বিভিন্ন বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়ে ভর্তি হোত।

এই সময়কালেই পন্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রভর্তির সংখ্যা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছয় এবং ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ সালে পি.জি. এবং পি.এইচ.ডি. প্রোগ্রামের জন্য ছাত্রসংখ্যা সর্বকালের মধ্যে সবথেকে বেশি নথিভুক্ত করা হয়।

ড. তারিন বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার পর ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫-তে মুসলমান ছাত্রভর্তির হার তারিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পূর্বের মতো হয়ে যায়। ইসলামিকরণের এই পুরো প্রক্রিয়াটা যদিও নীরবেই সম্পাদিত হয়েছিল, তবুও এটি ছিল একটি সন্দেহাতীত প্রত্যয়পূর্ণ লক্ষণ যার দ্বারা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে ২০০৯-১২ সালের মধ্যে মুসলমান ছাত্রবৃদ্ধির হার মোটেও স্বাভাবিক ছিল না। বরং ভারতের মুসলমান জনবসতিপূর্ণ বিভিন্ন বৃহৎ অঞ্চলের

ড. জে. কে. তারিন

ছাত্রদের মধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের দ্বারা এটি ছিল নিপুণভাবে পরিকল্পিত একটি কাজ।

প্রকৃতপক্ষে এইভাবে মুসলমান ছাত্রভর্তির ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আশঙ্কা ও ভয় বিরাজ করছিল। কারণ কিছু ছাত্র স্বীকার করেছিল যে এইভাবে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের মধ্যে কিছু সন্ত্রাসবাদীও থাকতে পারে। তাই এই বিষয়টি আই. বি.-র নজরে আনা হলে আই.বিও এই বিষয়ে সতর্ক হয়ে যায়।

ড. জে. কে. তারিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। তাই এই সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব বিল্ডিং কমিটির কাছে প্রেরণ করার জন্য তৈরিও করা হয়েছিল। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান কর্মী ও ছাত্রগণ যাতে শুক্রবারের নামাজ পড়তে পারে তার জন্য একটি পৃথক ঘর বণ্টনের প্রস্তাবও করেছিলেন ড. তারিন। যদিও এই বিষয়ে তিনি তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ইসলামিকরণের অপর একটি উদাহরণ হলো, ২০১১-এর ১৮ মার্চে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের অধ্যক্ষ ড. এম. রাজেন্দ্রন কর্তৃক পন্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাটেরিং-এর দায়িত্বে থাকা তিনটি সংস্থার উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার। এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশ, নির্দেশের ধরন এবং মর্ম ছিল অভিন্ন এবং অনেকটা ভীতিপূর্ণ।

ড. তারিন তাঁর উপাচার্যপদে থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যে তাঁর অবসরের পরেও ইসলামি পরিবেশ যথারীতি বহাল ছিল। এমনকী আফজল গুরুর ফাঁসির প্রতিবাদে মুসলমান ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শোভাযাত্রা পর্যন্ত বের করে। এটা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে এইরকম একটি কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটি প্ররোচনামূলক কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। ❙

দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতি ঘটলেই কি বাংলাদেশে হিন্দু নিধন বন্ধ হবে?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম বাংলাদেশ সফর বৈদেশিক কূটনীতির নিরিখে বিচার করলে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছে। অতীতে বাংলাদেশ এই পরিমাণ ভারতীয় শিল্প বিনিয়োগ পায়নি। নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর ভারত যেভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল তা নজিরবিহীন। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে মোদী সরকারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এখন এতটাই গভীর যে শ্রীলঙ্কা থেকে চীন পাততাড়ি গুটিয়ে স্বদেশে ফিরেছে। অর্থাৎ ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ভারত বিরোধী শত্রুরাষ্ট্র হচ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকে সফল আখ্যা দিতে তাই দ্বিধা নেই। মনে রাখতে হবে, ভারত এবং বাংলাদেশের মোট ৫০ হাজার মানুষ ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর 'রাষ্ট্রহীন' হয়ে জীবন কাটাচ্ছিলেন। তাঁদের রাষ্ট্র পরিচয় না থাকায় তাঁরা 'না ঘর কা না ঘাট কা' হয়ে এতকাল জীবন কাটাচ্ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁদের শাপমুক্ত করলেন। ছিটমহলগুলির বিনিময়ের পর তাঁরা ভারত অথবা বাংলাদেশের নাগরিক হলেন। আর কোনো জটিলতা রইলো না।

তবে একটি বিষয়ে মোদীজী নিরাশ করেছেন। বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে হিন্দুদের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন সেই প্রাক্তন বি এন পি সরকারের সময় থেকে চলছে আজও তা বন্ধ হয়নি। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে তাঁর সরকার মৌলবাদী জঙ্গিদের ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর চলা নির্যাতনের ব্যাপারে তিনি

গূঢ় পুরুষের কলম

একটি বাক্যও খরচ করেননি। বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ইউনিটি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, 'মৌলবাদী শক্তির হাতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় বাস করছেন বাংলাদেশের হিন্দুরা। মৌলবাদী শক্তি চাইছে হিন্দুরা যে দেশে জন্মেছে, বড় হয়েছে, সেই দেশ ছেড়ে চলে যাক। আমরা চাই নরেন্দ্র মোদী এই মৌলবাদী শক্তিগুলিকে কড়া বার্তা দিন।' মোদী সেই বার্তা দেননি। বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সে দেশের ধর্মীয় মৌলবাদ ও হিংসার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলে মোদীজী সেখানের সংখ্যালঘু মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারতেন। অথচ তিনি ঢাকা সফরে যাওয়ার আগে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর কুরশিতে বসে কড়া বিবৃতি দিয়েছিলেন যে ভারতে সাম্প্রদায়িকতাকে কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। উন্নয়নের মাধ্যমে উগ্র মৌলবাদীদের বিচ্ছিন্ন করা হবে। হিন্দুত্বের পথ ত্যাগ করে শুধুই উন্নয়নের শ্লোগান দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচনে নেমেছিল বিগত অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার। পরিণাম কী হয়েছিল তা সকলেরই জানা।

বাংলাদেশ জেহাদি মৌলবাদী জঙ্গিদের অত্যাচারে গৃহযুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মৌলবাদের বিরোধিতা করায় অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমানবাবু এবং অনন্তবিজয় দাশ খুন হয়ে গেছেন। তাঁদের রক্তের দাগ সে দেশের মাটিতে টাটকা। দফায় দফায় চলছে বিএনপি এবং জামাত ইসলামির তাণ্ডব ও হামলা। ২০০৯ সালে হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর জামাতুল মুজাহিদিন অব বাংলাদেশ (জে এম বি) এবং হুজি-কে অনেকটা ভোঁতা করে দেওয়া হয়। কিন্তু স্থায়ী লাভ হয়নি। ইয়েমেনে ঘাঁটিবাঁধা জঙ্গি নেতা আনওয়ার-আল- আওলাকির নেতৃত্বে ও আর্থিক সাহায্যে বাংলাদেশে নতুনভাবে মুসলমান মৌলবাদী জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। এই নেটওয়ার্কে যুক্ত বাংলাদেশি জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গকে তাদের বিস্ফোরক প্রস্তুতের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। বাংলাদেশে অপরাধ করে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে বাস করার জন্য বিশেষ শেলটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জঙ্গিদের মাধ্যমে চলছে কোটি কোটি টাকার জাল নোটের কারবার। আশা ছিল, এই ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশ যুক্ত বিবৃতি দেবে। তা হয়নি।

শুধুমাত্র দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতি ঘটলেই হিন্দু নিধন বন্ধ হবে অথবা জঙ্গিবাদ খতম হবে এমন আকাশ কুসুম চিন্তার বাস্তবতা নেই। ■

বঙ্গে এলেন রাহুল, সঙ্গে এল কপাল

মাননীয় রাহুল গান্ধী
সহ-সভাপতি, জাতীয় কংগ্রেস
১০নং জনপথ, নয়াদিল্লী
মাননীয় যুবরাজ,

আপনার বাংলা সফরের জন্য শুভেচ্ছা রইল। আবার আমরা দেখলাম আপনার হাতযশ। যবে থেকে কংগ্রেসের দায়িত্ব নিয়েছেন তবে থেকেই একের পর এক রাজ্যে কংগ্রেসের তালা পড়েছে। মুলায়ম সিংয়ের কল্যাণে মা'কে নিয়ে লোকসভা ভোটের বৈতরণী কোনোরকমে পার হয়েছেন বটে তবে আপনার নেতৃত্বে কংগ্রেসকে ডোবানোর রেকর্ড অক্ষুণ্ণ। দীর্ঘ সময় বিদেশে অজ্ঞাতবাসের পর দেশে ফিরেই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছেন। আপনি নাকি ভাঙাচোরা কংগ্রেসকে নিয়েই বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলবেন। স্বপ্ন ভালো। তবে বাংলার কংগ্রেসকে ভাঙার জন্য খুব বেশি লড়াই করতে হবে না। সে এমনিই ভেঙে আছে। আপনার সফরে সে ভাঙন শুধু আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

কাটোয়ার রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পর মালদহের সুজাপুরের বিধায়ক আবু নাসের খান চৌধুরী মানে লেবুবাবুও কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। কলকাতায় নেতাজী ইন্ডোরে কর্মীসভা শেষ করে আপনি যখন দিল্লীর বিমান ধরতে দমদম যাচ্ছেন, তখনই তৃণমূল ভবনে গিয়ে দলবদল করছেন লেবুবাবু। তিনি আবার বলেছেন, ‘‘দাদা (গনি খান চৌধুরী) উন্নয়নের জন্য কাজ করতেন। দিদিও (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) সেই উন্নয়নের কাজে সামিল। তাই আমি তৃণমূলে।’’ আপনার প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরী লেবুবাবুর দলত্যাগকে আমল না দিয়ে বলেন, ‘‘লেবু কচলে তেতো হয়ে গিয়েছে। জেতার পর থেকে উনি সুজাপুরে বেশি সময় দিতেন না বলে জেলা কংগ্রেস থেকেই অভিযোগ উঠেছে। আগামী বিধানসভা উনি যে দলের টিকিট পাবেন না, তা আগাম বুঝেই দল ছেড়েছেন।’’

এখানেই কি শেষ নাকি!

কংগ্রেসের অভ্যন্তরের দুর্দশার শেষ নেই। আপনার সফর নিয়ে ক্ষোভ উছলে পড়ছে। টার্গেট অবশ্য আপনি নন, প্রদেশ সভাপতি। তিন প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্র, মানস ভুঁইয়া, প্রদীপ ভট্টাচার্য, দুই সাংসদ আবু হাসেম (ডালু) খান চৌধুরী ও তাঁর ভাগ্নি মৌসম বেনজির নূর, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীপা দাশমুন্সিরা সবাই অধীর বিরোধী। অথচ তিনিই আপনার বাংলা রথের সারথি। রাজ্য কংগ্রেসে এখন তিন মতের জন্য তিন শিবির। এক দল মনে করে, ২০১৬-য় ফের তৃণমূলের হাত ধরা উচিত। দ্বিতীয় শিবির চায়, বামেদের সঙ্গে সমঝোতা। আর তৃতীয় দলের বক্তব্য, একলাই চলা উচিত। আপনি কী চান সেটা অবশ্য এখনও পরিষ্কার নয়। তবে অধীর বিরোধী সব নেতাই একটি প্রশ্নে একমত— দলে তাঁদের মর্যাদা নেই!

এই যে আপনি হুগলী জেলা সফর করলেন। অথচ সেখানে অনুপস্থিত প্রদেশ সভাপতি অধীর এবং অধীরের কট্টর বিরোধী আব্দুল মান্নান। একে তো যুবরাজ আপনার বক্তৃতায় সারদা-কাণ্ডের নাম গন্ধও ছিল না, উল্টে সারদা-কাণ্ডে ঘোর সরব মান্নানের বাড়ির পাশে রিষড়ার চটকলে আপনি ঘুরে বেড়ালেন অথচ মান্নানের আমন্ত্রণ নেই। মান্নানবাবু তো মিডিয়াকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ‘‘আমায় না ডাকলে কেন যাব? রিষড়ায় রাহুলের অনুষ্ঠানে কারা থাকবেন, দলের পক্ষে করে দেওয়া তালিকায় আমার নামও ছিল না। তার পরেও আমি গেলে তো এসপিজি বের করে দিত!’’ মান্নান-গোষ্ঠীর আর এক নেতা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, ‘‘যে ভাবে প্রতিদিন অসম্মান করা হচ্ছে, মান্নানদা বলেই এখনও কংগ্রেসটা ছাড়েনি!’’

যাই হোক আপনি তো ঘুরে গেলেন, আপনার সফরের পর দিনেই কাজ বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে হুগলির নর্থব্রুক, ইন্ডিয়া এবং হেস্টিংস তিন চটকল কর্তৃপক্ষ। শুধু হুগলিতেই গত এক মাসে পাঁচটি চটকলে কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

না না, এতে আপনাদের ভূতপূর্ব সরকারের দায় থাকলেও আপনার নেই। আর রাজ্য সরকারের এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দৌলতে রাজ্যে নতুন শিল্প যেমন আসতে নারাজ, পুরনোরাও পাততাড়ি গোটাতে চাইছে। মাঝখান থেকে কেস খেলেন আপনি। সব্বাই বলছে একে মা মনসা তাতে আবার ধুনোর গন্ধ। হুগলির জুটমিলে এমনই সঙ্কট তার ওপর আবার ফেলু রাহুলের ছায়া পড়েছে।

বাংলার মানুষের এমন বাজে ভাবনার জন্য আমি খুব ‘সরি’ যুবরাজ। আপনার কপালটাই খারাপ। সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। আপনি বরং বিদেশেই ভালো থাকেন।

— **সুন্দর মৌলিক**

বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ সচেতন দিবসের ভাবনা

এন. সি. দে

অনেকেই শুনে থাকবেন বিদেশে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকেন না। বৃদ্ধ-বাবা-মায়েরা হয় একক জীবন যাপন করেন, নয়তো বৃদ্ধাশ্রমে থাকেন। আগে এই সামাজিক ব্যাধি কেবলমাত্র পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ ওই দেশগুলো মূলত ভোগবাদী দর্শনে বিশ্বাসী। পারিবারিক সুখনীড় গড়া তাদের দর্শনে নেই। কিন্তু ভারতীয় সমাজ 'ত্যাগের মাধ্যমে ভোগের দর্শনে' বিশ্বাসী। এই সমাজ আজ পশ্চিমি ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো কেমন করে?

এই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ আজকের বিষয় নয়। শুধু এটুকু বলা যেতেই পারে যে, ১৯৪৭ সালে যারা এদেশের ক্ষমতায় বসেছিল তারা ছিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী। গত ৬৮ বছর ধরে এই দেশটাকে তারা ধীরে ধীরে নানান আত্মঘাতী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পশ্চিমি পুঁজিবাদের গোলামে পরিণত করেছে। আজ এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ভারতের অর্থমন্ত্রী কোনো ট্যাক্স চাপাতে গেলেও ঘাড়ধাক্কা খেতে হচ্ছে। প্রণব মুখার্জিকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে নির্বাসিত হয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের আরাম নিকেতনে বন্দী করে দেওয়া হয়েছে শুধু জেনারেল অ্যান্টি অ্যাভয়ড্যান্স রুলস্ (GAAR) পেশ করেছিল বলে। চিদাম্বরম ওই আইন পাশ করানোর সাহস দেখানোর পথে না হেঁটে তা ৩ বছরের জন্য স্থগিত করে দিয়েছিলেন। অরুণ জেটলিও ঘাড় ধাক্কা খাওয়ার হাত থেকে বাঁচতে সঙ্গে সঙ্গে ওই আইনকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি বিদেশিদের উপর ন্যূনতম ট্যাক্স (মিনিমাম অলটারনেটিভ ট্যাক্স) চাপানোর কথা উচ্চারণ করেছিলেন মাত্র। তাতেই তারা হুমকি দিয়ে শেয়ার বাজার থেকে তাদের শেয়ার তুলে নিতে শুরু করে। ভয় পেয়ে জেটলিজি এই ট্যাক্সও তুলে নেওয়ার পথে।

আজ ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে পশ্চিমি পুঁজিবাদী প্রভাব ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। পশ্চিমি 'খাও-পিও-জিয়ো' আর 'জোর যার মুল্লুক তার' দর্শনে প্রলুব্ধ হয়ে ভারতের সক্ষম পুরুষ ও নারীরা আজ ভোগের সন্ধানে মত্ত হয়ে বাবা-মাকে ফেলে রেখে অর্থের পিছনে ছুটছে। শহরের স্বচ্ছল বাবা-মায়েরা বাধ্য হচ্ছে একক জীবন-যাপন করতে, তারাই আজ খুনি-ডাকাতদের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। আর গ্রামের গরিব বাবা-মায়ের অবস্থা আরও করুণ। তাদের পরিবারের সকলে কাজের সন্ধানে দেশান্তরী হচ্ছে। বাবা-মায়েরা রাস্তার ভিখারিতে পরিণত হচ্ছে

আজ ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে পশ্চিমি পুঁজিবাদী প্রভাব ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। পশ্চিমি 'খাও-পিও-জিয়ো' আর 'জোর যার মুল্লুক তার' দর্শনে প্রলুব্ধ হয়ে ভারতের সক্ষম পুরুষ ও নারীরা আজ ভোগের সন্ধানে মত্ত হয়ে বাবা-মাকে ফেলে রেখে অর্থের পিছনে ছুটছে।

সারা পৃথিবীতে প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। পরিসংখ্যানবিদদের মতে, এই হার বাড়তে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১৫ বছরের কম বয়সীদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা প্রায় ৮৭ কোটি। ভারতে এই সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১৮ কোটিতে পৌঁছে যাবে। তবে সবচেয়ে চিন্তার কথা হল, প্রায় ২ কোটি বৃদ্ধ পিতা বা মাতা আজ এদেশে একক অসহায় জীবনযাপন করছেন। শহর কেন্দ্রিক সভ্যতার ফলে গ্রামের বেশিরভাগ পিতা-মাতাই আজ অসহায়, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষাহীন একক জীবনযাপন করছেন।

পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোয় প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যা কেবল একক জীবন যাপন করা। তাদের অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। তাদের ঘিরে রয়েছে নানান ধরনের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। পৌরসভাগুলির প্রতিটি ওয়ার্ডে রয়েছে প্রবীণ নাগরিক ভবন, যাকে আমরা বলি 'বৃদ্ধাশ্রম'। এগুলো অত্যন্ত উন্নতমানের। যে সমস্ত প্রবীণ নাগরিক নিজ গৃহে একা বাস করছেন, তাদের সঙ্গে পৌরসভার স্বাস্থ্য-বিভাগের রয়েছে 'হেল্পলাইন' যোগাযোগ। তাদের দেখভাল ও স্বাস্থ্য চেক আপের রয়েছে সুবন্দোবস্ত। এই কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) যেমন বলেছে, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য প্রয়োজন উন্নত জীবনযাত্রা। তেমনই রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘোষণা করেছে ১৫

জুন প্রতি বছর পালন করতে হবে ‘বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ সচেতনতা দিবস’। কিন্তু কীভাবে? নিগ্রহ বলতে কি বোঝায়? কীভাবে এইসব নিগ্রহ থেকে প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষা করা যেতে পারে?

‘নিগ্রহ’ কথাটি থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে নিগ্রহকারী কে বা কারা? ‘নিগ্রহ বন্ধ করতে গেলে নিগ্রহকারীকে শাস্তি দিতে হবে’—এই বিদ্বেষমূলক ধারণা পুঁজিবাদী শাসকরা গড়ে তুলতে সিদ্ধহস্ত। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় শেখানো হয়— ‘মা বিদ্বিষা বহে’ (কারও প্রতি বিদ্বেষ বহন করো না)। একের প্রতি অপরকে ব্যবহার করাই পুঁজিবাদী শাসকদের কৌশল। যেমন নারী-স্বাধীনতার প্রশ্নে সমাজে নারীর মনে এক ধরনের পুরুষ-বিদ্বেষ জাগ্রত করা হয় যা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে। প্রবীন নাগরিকদের নিগ্রহ সম্পর্কেও নবীন নাগরিকদের প্রতি বিদ্বেষ জাগ্রত করা আমাদের উচিত নয়। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পিতা তার সন্তানদের পালন করে, মাতা লালন করে। পিতা-মাতা বৃদ্ধ হলে তাদের ভার বহন করাও সন্তানদের কর্তব্য। এটি একটি ভারতীয় সামাজিক বিধি। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা সামাজিক নয়। এটি একটি ব্যক্তিবাদী, ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা। আজকের প্রবীণ নাগরিকদের নিগ্রহের জন্য দায়ী এই বাজার অর্থনীতির প্রবক্তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। প্রবীণ নাগরিকদের অসহায় একক জীবন যাপন এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি। তাই প্রবীণ নাগরিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব।

প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষার জন্য এদেশে জাতীয় স্তরে একটি আইন প্রণয়ন হয়েছে, যার নাম ‘মেইন্টেন্যান্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ পেরেন্টস্ অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যাক্ট ২০০৭’। জাতীয় স্তরে এই আইন তৈরি হলেও প্রায় বেশীর ভাগ রাজ্যেই এই আইনের ভিত্তিতে কোনো রুলস্ তৈরি হয়নি।

প্রবীণ নাগরিকদের সুরক্ষার জন্যে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিগ্রহের হাত থেকে বাঁচাতে ওই MWPSC Act-এ গৃহীত স্কীমগুলি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাটা অত্যন্ত জরুরি। এই স্কীমে আছে প্রবীণ নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সর্বদা দৃষ্টি রাখার জন্য জাতীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরে ‘হেল্প লাইন’ চালু করা; প্রবীণ নাগরিকদের ন্যাশনাল কমিশন এবং ন্যাশনাল ট্রাস্ট গড়ে তোলা। কিন্তু আজও এগুলি শুধু আইনের বইয়ের পাতাতেই আবদ্ধ হয়ে আছে।

২০০৭ সালে আইন তৈরি হলেও প্রথম ন্যাশনাল কাউন্সিল গড়তে লেগে যায় ৫ বছর। ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সালে গঠিত এই ন্যাশনাল কাউন্সিলের বৈঠকই ডাকা হয় না। প্রতিটি রাজ্যে এই আইন চালু না হওয়ায় স্টেট কাউন্সিলও গঠন করা হয়নি। এই রাজ্যেও হয়নি। তাই রাজ্যগুলির কোনো প্রতিনিধিই ন্যাশনাল কাউন্সিলে নেই।

প্রবীণ নাগরিকদের সম্পর্কে সমস্ত রকম তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিটি রাজ্যে রিজিওনাল রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টার গড়ার কথা। এই রাজ্যে তেমন সেন্টারের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না।

গ্রামাঞ্চলে প্রবীণ নাগরিকদের করুণ অবস্থা লাঘবে রাজ্যগুলিকে বলা হয়েছে পঞ্চায়েত বা পৌরসভাগুলির সাহায্যে ‘ডে কেয়ার’ সেন্টার গড়ে তুলতে যেখানে প্রবীণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে।

MWPSC Act-এ প্রতিটি জেলায় একটি করে বৃদ্ধাশ্রম (old-Age Home) গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা গত ৭-৮ বছরে একটিও গড়ে তোলা হয়নি। আমাদের দেশের ৭১ শতাংশ মানুষ অপ্রথাগত শিল্পে নিযুক্ত যাদের অবসরকালীন কোনো সুবিধাই নেই। ২৯ শতাংশ শ্রমিক নামমাত্র পেনশন পান। ১৮৬টি শিল্প ও কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে মাত্র মাসিক ন্যূনতম ১০০০ টাকা পেনশন মেলে যার সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি সূচক মহার্ঘভাতা (DA) কখনও মেলে না। সারা জীবন ওই ১০০০ টাকা পেনশনেই নির্ভর করতে হয় আমাদের দেশের তথাকথিত সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের।

আমাদের দেশের প্রবীণ নাগরিকদের তাই সচেতন হতে হবে রাষ্ট্রীয় নিগ্রহ সম্পর্কে। তাদের দাবি রাষ্ট্রের কাছে, সরকারের কাছে ও শাসক দলগুলির কাছে।

(লেখক পশ্চিমবঙ্গ প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘের সম্পাদক)

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657,Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

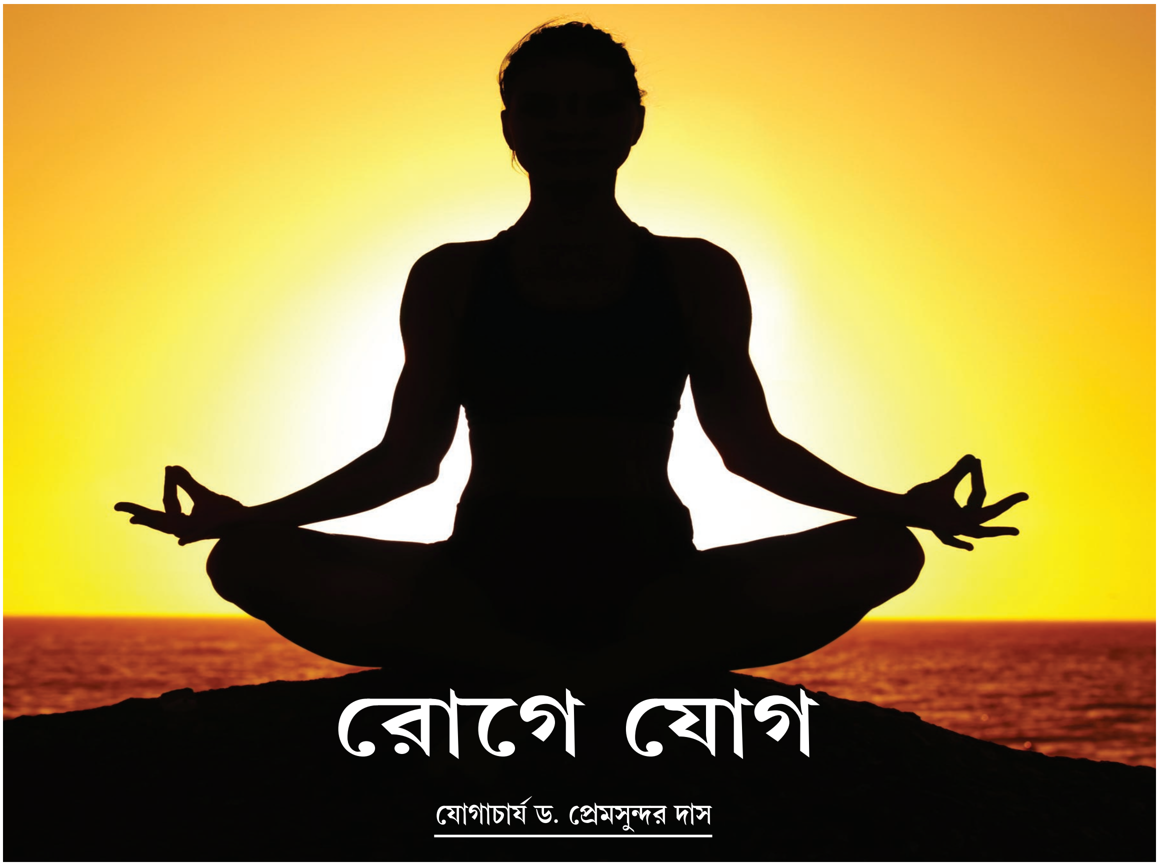

রোগে যোগ

যোগাচার্য ড. প্রেমসুন্দর দাস

স্বাস্থ্যচর্চার অন্যান্য যত প্রকার পদ্ধতি আছে, যোগাসনের পদ্ধতি তাদের সকলের থেকে পৃথক। কারণ এই পদ্ধতি কেবল শরীরের যন্ত্রাদি, পেশী অথবা শারীরিক গতিবিধির ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে শিক্ষা দেয় না, যে জাগ্রত শক্তি শরীরের মাংসপেশী সমেত প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তেজ ও জীবনীশক্তি নিয়ে সুনিহিত রয়েছে, তাকে উজ্জীবিত করে তোলে। এইজন্য যোগাসনে দেহের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে মনের দৃঢ়তাও সংযুক্ত। ভারতীয় যোগীরা তাঁদের শরীর ও মনকে দৃঢ়ভাবে গঠিত করবার জন্য স্বাস্থ্যচর্চার এই কৌশলগুলি অভ্যাস করতেন। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহ গঠিত হয়ে ওঠে। যোগব্যায়াম শরীরের সকল ক্ষয়প্রাপ্ত মাংসপেশী ও তন্ত্রীকে কোনো বিশেষ শক্তি প্রয়োগ না করে, স্বাভাবিক এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শক্তিশালী করে তোলে। কীভাবে শরীরের শিথিল মাংসপেশী ও অপরাপর তন্ত্রীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত শক্তিশালী করে নবজীবন লাভ করা যায়, এ পদ্ধতি হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত্রসমূহ, শিরা-উপশিরা, রসধারণকারী গ্লান্ড সমূহ, মস্তিস্ক ও মেরুদণ্ডস্থিত আয়ুকেন্দ্র প্রভৃতি মানবদেহের অনায়ত্ত ও অনিচ্ছাধীন যন্ত্রাদিকে অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত না করে (যা অন্যান্য বল প্রয়োগ সমন্বিত ব্যায়ামে সচরাচর হয়ে থাকে) তাদের কার্যের উন্নতিসাধন করে শরীরের যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া পদ্ধতি আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, যোগব্যায়াম সেগুলিরও সজ্ঞান সামঞ্জস্য ও সুব্যবস্থার বিধান করে। যেটি সাধারণত বর্তমান শরীর গঠন পদ্ধতিতে উপেক্ষিত হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য মানে বহু বর্ষ ধরে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা বা কোনো প্রকারে জীবনটাকে শরীরের মধ্যে ধরে রাখা নয়। কিছুকাল ডাক্তারের সাহায্য না নিয়ে হাসপাতাল থেকে দূরে থাকলেই স্বাস্থ্যলাভ করা হল না। শরীরের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি উৎপাদন করা, শ্রম ও কষ্ট সহ্য করার মতো শরীরকে সুদৃঢ় করা, অফুরন্ত মানসিক শক্তি সঞ্চালনে আনন্দ উপভোগ করাই যোগাসনের প্রধান উদ্দেশ্য।

দিনকাল যা পড়েছে তাতে নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা নির্বিশেষে প্রত্যেককেই কাজ করতে হচ্ছে এবং সেই কাজের মধ্যে অনেক কাজই আবার এক জায়গায় বসে। রিসেপশনিস্ট, ক্লার্ক, এক্সিকিউটিভ, অফিসার, কম্পিউটার অপারেটর— এঁদের তো দীর্ঘক্ষণ চেয়ারে বসে থাকতে হয়। বিশেষ করে রিসেপশনিষ্ট, কম্পিউটার অপারেটর, টেলিফোন অপারেটরদের চেয়ার থেকে নড়ার কোনো সুযোগ থাকে না। এভাবে দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকলে শরীরের নানা অসুবিধে, রোগ ইত্যাদি হতে পারে। জীবনধারণের জন্য, প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের এসব কাজ করতে হয়। আবার অনেকে হয়তো শখেও কাজ করে থাকে। কিন্তু জীবনে সুখের প্রয়োজনে এই যে কাজ করা তা অসুখে

পরিণত না হয়, শান্তি যেন অশান্তিতে পর্যবসিত না হয়, আনন্দ যেন নিরানন্দে রূপান্তরিত না হয় তা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের শরীরের কারণে শরীরের রোগ হয়। মনের কারণে মনের রোগ হয়, আবার মনের কারণেও শরীরের রোগ হয়, এ ধরনের রোগ সাইকোসোম্যাটিক ক্যাটিগরিতে পড়ে। এটা বলা প্রয়োজন এজন্যে যে, সুস্থ শরীরেই সুস্থ মন থাকে, শরীর ও মন পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পর নির্ভরশীল।

দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে বসে কাজ যাকে পরিভাষায় বলে সিডেনটারি জব স্টাইল, তাতে মনের সঙ্গে সুস্থ শরীরের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু মনের প্রভাব থাকে। দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে একই কাজ করতে করতে একঘেয়েমি আসে। কাজ করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু উপায় নেই, জোর করে কাজ করতে হয়। ফলে মনের ওপর চাপ পড়ে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। আলস্য লাগে। একঘেয়েমি ও আলস্য কাটাতে কাপের পর কাপ চা, সিগারেটের পর সিগারেট, কেউ কেউ পান জর্দা কিংবা নস্যি নিতেই থাকেন। ক্ষতি হয় পেটের, ফুসফুসের। গ্যাসট্রাইটিস দেখা দেয়। কেউ বা কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি নানা রোগে আক্রান্ত হন। মন ভালো না থাকলে তার প্রভাব পড়ে শরীরের নানা অঙ্গে ও যন্ত্রে। ফলে পরিপাক, রেচন ইত্যাদি ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাড়ে রক্তচাপ। হতে পারে হাইপারটেনশন। শরীরের প্রভাব পড়ে কাজে। যে কাজটা দু'মিনিটে হতে পারত তা ১৫ মিনিট বা আধঘণ্টা সময় নিয়ে নেয়। কিন্তু এসবই হল পরোক্ষ ক্ষতি। একটা মানুষ এক জায়গায় একইভাবে বসে একটানা ৮/১০ ঘণ্টা কাজ করলে হয়তো শারীরিক পরিশ্রম (Physical Strain) হয় না, শারীরিক ক্লান্তিভাব আসে না ঠিকই কিন্তু এভাবে বসে থাকলে Functional Adaptation of locomotion হয় না বলে শরীরের নানা জোড়ে (joint) স্টিফনেস দেখা দিতে পারে। হাঁটু, কোমর, কাঁধ, কনুই প্রভৃতি জোড়ে joint arthopathy develop করতে পারে। শরীরের বিভিন্ন পেশীর ব্যবহার কম হওয়ায় পেশীর কর্মক্ষমতা কমে যায়। স্পাইন্যাল মবিলাইজেশন হয় না। স্মল ও লার্জ জয়েন্টসগুলো ফুলে যায়, ব্যথা করে। শেষমেশ হয়তো হাঁটু প্রতিস্থাপনও করাতে হতে পারে। সার্ভাইকাল স্পন্ডেলো আর্থ্রাইটিস দেখা দিতে পারে যা সহজ কথায় ঘাড়ের স্পন্ডিলোসিস। পেরি আর্থ্রাইটিস বা ফ্রোজেন শোল্ডার, নি জয়েন্ট আর্থ্রাইটিস, অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস যাকে হিপ জয়েন্ট আর্থ্রাইটিস বলে ইত্যাদি হয়। অর্থাৎ প্রতিটি জয়েন্টেই আলাদা আলাদা রোগ তৈরি হয়। এগুলো সব ডিজইউজ জয়েন্ট সিনড্রোম। সমস্ত জয়েন্টগুলি একসঙ্গে আক্রান্ত হলে তখন বলা হয় পলিআর্থ্রালজিয়া। এইভাবে নিজের অজান্তেই মানুষ রোগের শিকার হয়ে পড়ে। চিকিৎসা পরিভাষায় এই রোগের নাম Articular Rheumatism, সেটা ডিজেনেটিভ বা ইনফ্ল্যামেটারি দু'রকমই হতে পারে। সিডেনটারি জব স্টাইলের সঙ্গে মানসিক চাপ যাকে বলে--- সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস ও স্টেইন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস বা টেনশনের শিকার হলে যাকে বলে গোদের ওপর বিষফোঁড়া তাই হয়ে ওঠে বিষয়টা। একা জয়েন্টের ব্যথায় রক্ষা নেই সঙ্গে মানসিক চাপ হাজির। মানসিক চাপ থেকে পেটের রোগ ইত্যাদি হতে পারে। হতে পারে হাঁপানি, ডিপ্রেশনাল ইরিটোবিলিটি অর্থাৎ খিটখিটে মেজাজ। সেইজন্যে সিডেনটারি জব স্টাইলে মানসিক প্রশান্তিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত রোগ আমরাই তৈরি করি সেটা শারীরিক হোক, মানসিক হোক বা মনের কারণে শারীরিক হোক। খাওয়া-দাওয়ার বদ অভ্যেস থেকেও নিউট্রিটোটিভ ডিসঅর্ডার হতে পারে। অফিসে বসে বসে যা পাচ্ছি তাই খাচ্ছি। সিন্থেটিক ফুড, জাঙ্ক ফুড সব খাচ্ছি। শরীরের জন্যে খাচ্ছি না জিভের জন্যে খাচ্ছি তা খেয়াল রাখছি না। এখানে মনে রাখতে হবে খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়, বাঁচার জন্য খাওয়া। এনার্জি পাচ্ছি না। দশ কাপ চা খেয়ে নিলাম। ফলে অম্বল হচ্ছে, ক্ষিদে পাচ্ছে না। কিংবা পেট পুরে একগাদা মশলাদার ভাজাভুজি খেয়ে পেট আইঢাই, গলা বুক জ্বালা। সাময়িক উপশমের কথা ভেবে বোতল বোতল কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে নিই। ভাবি, শান্তি পেলাম। কিন্তু এইসব সিন্থেটিক ফুড, জাঙ্ক ফুডই হেপাটিক ডিস্ফাংশান তৈরি করে। হজমশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। যত বেশি জাঙ্ক ফুড, সিন্থেটিক ফুড খাবো হজমশক্তি তত কমবে। শরীরে টকসিন বাড়বে। টকসিন যত বাড়বে ততই Systemetic disfunction বাড়বে, Joint Stiffness বাড়বে। অফুরন্ত প্রাণশক্তি কমবে, এক ঘণ্টার কাজ চার ঘণ্টা সময় লাগবে। আত্মবিশ্বাস কমবে, কর্মক্ষেত্রে অশান্তি বাড়বে, সংসারে অশান্তি। নিজস্ব জীবনেও অশান্তি। এইসব নানান প্রতিবন্ধকতাকে ঠেকানোর উপায় কী?

দৈনিক ২০ মিনিট বা ৩০ মিনিট করে যোগাভ্যাস এইসব প্রতিবন্ধকতার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। যোগ হচ্ছে শরীর ও মনের সমন্বয় স্থাপনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। It is Science of intigration of physical health and mental health। মনে রাখা উচিত যতদিন বাঁচবো, সুখে বাঁচবো। এই সুখের জন্য লাগে সংযম আর নিয়ম। এ দুটি হলো যোগশাস্ত্রের দুটি স্তম্ভ। প্রতিদিন যোগভ্যাস করলে শরীরের বিভিন্ন সিস্টেম বা তন্ত্রগুলি ঠিকঠাক কাজ করে। পাচনতন্ত্র, পেশীতন্ত্র, সংবহনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র প্রভৃতি সুস্থ থাকে। যোগের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। দরকার শুধু অভ্যেস আর বিশ্বাস। বিশ্বাসই এনে দিতে পারে সাফল্য। অনেক সময়ে প্রতিভা থাকলে তার উপযুক্ত বিকাশ হয় না আলস্যের জন্য। আলস্যকে পরিহার করে, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে পরিশ্রম করার জন্য যোগ অপরিহার্য। তাই তো প্রয়োজন সুস্থ শরীর, সুস্থ মন, সঙ্গে নৈতিক যোগ অর্থাৎ সুব্যবহার, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা বা সদাহাস্যমুখ ইত্যাদির পরিবেশন। ■

যোগময় জীবনে অষ্টাঙ্গ যোগের উপযোগিতা

মহামায়া রায়

দেবভূমি ভারতবর্ষ। যোগের পীঠভূমি ভারতবর্ষ। যোগাগ্নিময় ব্যক্তিদের পবিত্র চরণ স্পর্শে ভারতের মাটি গৌরবান্বিত। উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে শান্তি ছিল বিরাজমান। আধুনিক সভ্যতার চাকার তলায় পিষ্ট হয়েছে বৈদিক সভ্যতা। হারিয়ে গেছে মানবিক মূল্যবোধ। বিনষ্ট হয়েছে পারস্পরিক সহনশীলতা। চারিদিকে আকাঙ্ক্ষা আর তাকে চরিতার্থ করার প্রয়াস। মানসিক তথা শারীরিক নানাবিধ সমস্যায় মানুষ আজ জর্জরিত। ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষিত হলে তবেই সমাজ টিকে থাকবে। সামাজিক স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। সুস্থ থাকার জন্য যোগ অভ্যাস একান্ত জরুরি। সমস্ত সংকীর্ণতা দূরে সরিয়ে যোগ-কে গ্রহণ করতে হবে। সুস্থ থাকার অধিকার জন্মসিদ্ধ অধিকার। যোগ অভ্যাসে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। স্বাস্থ্যের উন্নতিতে যোগের উপযোগিতা তর্কাতীত। এটি একটি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা পদ্ধতি। যোগ ও প্রাণায়াম অভ্যাসে আমাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যোগ হচ্ছে জীবনের আধার, শরীর ও মন উভয়ের ওপরই এর প্রভাব অপরিসীম। এর প্রভাব সরাসরি স্নায়ু ও মস্তিষ্কের উপর পড়ে, ফলে বিচারধারা সুন্দর হয়। যোগ স্বয়ং এমন এক বিচারধারা যা নিয়ে কোথাও কোনো মতভেদ নেই। এর চর্চা মানসিক চাপ দূর করে, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে। অসাধ্য রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অসংযমিত জীবন অশান্তির কারণ, যোগচর্চা মানুষকে সংযমী করে তোলে। 'ন যুজ সমাধৌ' ধাতু থেকে তৈরি হয়েছে 'যোগ' শব্দটি— যার অর্থ যুক্ত করা, সমাধি এবং সমাধান। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটায় যে বিধি, তা-ই হলো যোগ। যোগ দ্বারা ব্যক্তি সমাধি প্রাপ্ত হয়। এর দ্বারাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে মনকে সংযমী করে মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা যায় সহজেই। যোগসাধনা দ্বারা ব্যক্তির মন 'একাগ্র, শান্ত হয়ে ওঠে। জ্ঞানালোক প্রকটিত হয়। আত্মশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠা যায়।

যোগময় জীবন গড়ে তোলার জন্য যোগের জনক মহর্ষি পতঞ্জলি নির্দেশিত 'অষ্টাঙ্গ যোগ'-এর চর্চা অবশ্য আবশ্যক। যম-নিয়ম-আসন- প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি— যোগ-সাধনার এই আটটি অঙ্গ নিয়ে 'অষ্টাঙ্গ যোগ'। যম-নিয়ম ছাড়া সাধনা অর্থহীন। আত্মিক শুদ্ধির জন্য যম-নিয়মকে 'নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। নিজের জীবনকে সফল করে তুলতে গেলে, 'মোক্ষপ্রাপ্তি' করতে গেলে যম-নিয়মকে পালন করতে হবে।

যম : "অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ"— অহিংসা— হিংসা না করা, সত্য— সকল কর্মে-ভাবে সৎ আচরণ প্রকাশ করা। অস্তেয়— চুরি না করা। ব্রহ্মচর্য— বীর্যরক্ষা, জ্ঞান অর্জন ও আত্মদর্শন করা। অপরিগ্রহ— প্রয়োজনের বেশি কারো থেকে কিছু গ্রহণ না করা। এই পাঁচ ক্রিয়া যোগের ভিত্তিস্বরূপ। এগুলো পালনের দ্বারাই ব্যক্তি নিজের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কল্যাণ সাধন করেন।

নিয়ম : "শৌচসন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ।" শৌচ— শরীর এবং মনের শুদ্ধিকরণ। সন্তোষ— মনের শান্তভাব, তুষ্টিরতার প্রকাশ করা। তপ— লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠাকে অবিচল রেখে কর্ম সম্পন্ন করা। ঈশ্বরপ্রণিধান— নিজের সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত করা।

মানবজীবনে যম-নিয়ম সঠিক গুরুত্ব না পাওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে অবক্ষয়। প্রত্যেক যোগসাধকের উচিত যম-নিয়মকে পালন করে আত্মিক উন্নতি সাধনের দ্বারা স্রষ্টার সৃষ্টিকে সুরক্ষিত রাখা।

আসন : 'স্থিরসুখমাসনম্'— স্থূল দেহের সুস্থতা রক্ষা করে আসন। যোগাসনের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাচীনকালের ঋষিরা প্রকৃতিকে অনুসরণ করেছিলেন। আসন অভ্যাসের দ্বারা শরীরের মাংসপেশী মজবুত হয়ে ওঠে। স্কেলিটন সিস্টেম, নার্ভ সিস্টেম, ইন্টার্নাল অরগ্যানস্ অস্থি, সন্ধি মজবুত হয়ে ওঠে।

প্রাণায়াম : 'প্রাণায়াম' শব্দের অর্থ প্রাণশক্তির বিস্তার। যে কোনো ব্যক্তির আয়ু তার শ্বাসের ওপর আশ্রিত। সূক্ষ্ম অর্থে প্রাণের তাৎপর্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত ঈশ্বর প্রদত্ত সেই শক্তি যার দ্বারা জগৎ ক্রিয়াশীল থাকে। নিয়মিত প্রাণায়াম অভ্যাস করলে শরীরে প্রাণশক্তি বৃদ্ধি হয়। রেসপিরেটরি সিস্টেম, ব্লাড সার্কুলেশন সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ আসে। ফুলফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রাণায়ামের বিভিন্ন প্রকার আছে।

আর সেগুলো যথাযথভাবে অভ্যাসে বিভিন্ন ফল লাভ হয়। সহজ প্রাণায়াম অভ্যাসে ব্যক্তির মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। সূর্যভেদ প্রাণায়ামে সর্দি-কাশিজনিত সমস্যা দূর হয়। শীতলী প্রাণায়ামে শরীর ঠাণ্ডা হয়। অনুলোম-বিলোম স্নায়ুমণ্ডলীকে সতেজ করে। নিয়মিত প্রাণায়াম অভ্যাসে মন ধীরে ধীরে বহির্মুখী থেকে অন্তর্মুখী হতে থাকে।

প্রত্যাহার : বিষয় থেকে মন-কে সরিয়ে এনে মন এবং ইন্দ্রিয়কে জয় করে ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী করাই হচ্ছে প্রত্যাহার। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধাদির প্রতি সাধকের আসক্তি কমে যায়। আকাঙ্ক্ষা, লোভ মোহ থেকে সাধক সহজেই নিজেকে সরিয়ে এনে পরম সুখ অনুভব করতে থাকেন।

ধারণা : প্রত্যাহার দ্বারা যখন মন ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে তখন বিশেষ কোনো স্থানে মনকে স্থির করাই হলো ধারণা। 'ধারণা'-র নিয়ত অনুশীলনের দ্বারা ধ্যানের প্রশস্ত পথ তৈরি হয়।

ধ্যান : 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্'। যে ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তকে নিবিষ্ট করা হয়, সেখানে ধ্যেয়ের প্রতি বৃত্তির নিরন্তর প্রবাহ একইভাবে বয়ে চলাই হলো ধ্যান। অন্তর্যামী ব্রহ্মের আনন্দময়, জ্যোতির্ময় এবং শান্তিময় স্বরূপে মগ্ন হয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে ধ্যান। ধ্যান আমাদের জীবনের অপরিহার্য। ধ্যান মানুষের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে। সাধক ওঙ্কার জপ অবলম্বনে ধ্যান করলে সর্বব্যাপক, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপরমেশ্বরকে সর্বত্র অনুভব করে তাঁর দিব্য স্বরূপে বিলীন হয়ে যান। ঘুমোবার আগে ধ্যান করলে নিদ্রাও যোগময়ী হয়ে ওঠে।

সমাধি : সকল প্রকার বিচার থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র ধ্যেয় অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ আর স্বভাবকে প্রকাশিত করে শূন্যের স্থিতিই হচ্ছে সমাধির অবস্থা। ধ্যান করতে করতে সাধক নিজেকে ভুলে পরমেশ্বরের আনন্দময়, শান্তিময়, জ্যোতির্ময় স্বরূপে নিমগ্ন হয়ে যান— দু'য়ের মধ্যে আর কোনো ভেদ থাকে না। জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে সমাধির আনন্দ উপভোগ করেন। সাধকের দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

(লেখিকা মহিলা পতঞ্জলি যোগ সমিতির রাজ্য প্রভারী)

সত্যিকারের যোগীর লক্ষণ

ডাঃ নীরেন মজুমদার

''শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ য়ে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়......।।''

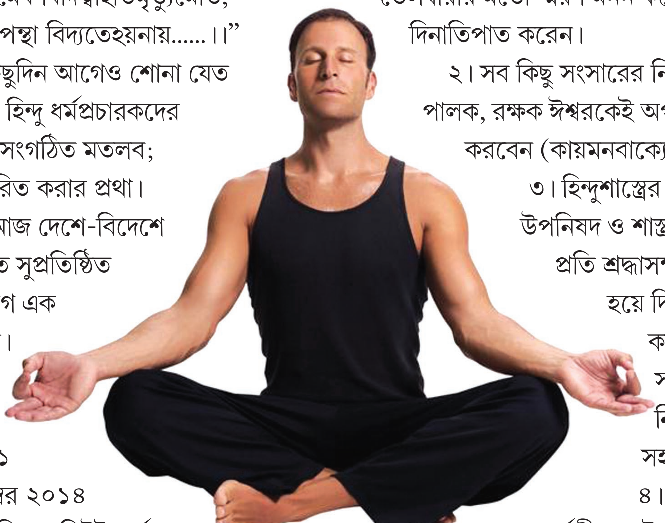

কিছুদিন আগেও শোনা যেত 'যোগ' হিন্দু ধর্মপ্রচারকদের একটা সংগঠিত মতলব; ধর্মান্তরিত করার প্রথা। কিন্তু আজ দেশে-বিদেশে এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত যে যোগ এক বিজ্ঞান। তাই তো গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে ১৭৭টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে United Nations Organization (UNO) মিটিংয়ে ঘোষণা করেছেন, 'বিশ্ব যোগ দিবস' হিসাবে ২১ জুন ২০১৫ থেকে দিনটি প্রতিবৎসর পালিত হবে। ১৭৭টি দেশের সম্ভবত কারুর পক্ষেই এই মত অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। তাই UNO-তে ভারতীয় অ্যাম্বাসাডার অশোক মুখার্জি কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে ২১ জুন পালিত হবে International Yoga Day.

এখন প্রশ্ন— আমরা এখন নিজেরা এই যৌগিক বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করি কিনা? আমাদের সনাতন শাস্ত্র কি বলেছে সেটাও জানার প্রয়োজন।

পতঞ্জলি বলেছেন— 'সমত্বং যোগমুচ্যতে'। যোগ নিজেকে জানার বিজ্ঞান। অন্তরে বিশ্বাস জাগাতে হবে। সঙ্গে শাস্ত্রচর্চারও প্রয়োজন। পরমকে পাওয়ার একমাত্র অবলম্বন যোগ। আগে মন-কে শান্ত করতে হবে, সেটা খুবই দরকারি। তাই সত্যিকারের যোগীর লক্ষণগুলি হলো—

১। সদাসর্বদা ঈশ্বর প্রণিধান অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো স্মরণ মনন করেন ও দিনাতিপাত করেন।

২। সব কিছু সংসারের নির্মাতা, পালক, রক্ষক ঈশ্বরকেই অর্পণ করবেন (কায়মনবাক্যে)।

৩। হিন্দুশাস্ত্রের বেদ উপনিষদ ও শাস্ত্রাদির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে দিন কাটান; সম্পূর্ণ নির্ভরতা সহায়ে।

৪। যিনি সর্বজীবকে ঈশ্বর সমতুল্য মনে করেন— সকল প্রতীয়মান বস্তুতেই ঈশ্বর দর্শন করেন।

৫। সংসারে বিষয়ভোগে চার প্রকার দুঃখ অনুভব করেন।

৬। বিষয়ভোগে যাঁর সুখ অনুভূতি আসে না— যাঁর ইন্দ্রিয় ভোগের প্রতি সম্পূর্ণ সংযম লক্ষণীয়।

৭। যিনি ঈশ্বর প্রদত্ত সাধনাকে ঈশ্বরের আদেশ বলে মনে করেন ও সাধনপথে ঈশ্বর অদিষ্ট অনুভব করেন।

৮। যিনি ফলের আশা না করে নিষ্কাম কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

৯। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজ সংসারে মেনে নিতে হয় শান্তি বজায় রাখার জন্য। যোগী সহ্য ও সহিষ্ণুতার প্রতীক।

১০। সাধু-সন্ন্যাসীর মানসিক ত্যাগই আসল। তিনিও সন্ন্যাসের সময় নিজেকে আহুতি দিয়ে ফেলেছেন আর নিজের

কোনো চিন্তা নেই; যা শুনছেন, যা গ্রহণ করছেন বা পরিত্যাগ করছেন— সবই তাঁকে মানে ঈশ্বরকে অর্পণ করেন।

গৃহীদেরও ভক্তিপথে এগোনোর উপায় আছে। ইচ্ছার প্রাবল্য, সদগুণাবলী আহরণ, সত্যের প্রতি সতর্কতা ও সাবধানতা অথবা জীবনযাপনের প্রতি অনীহা সতর্ক দৃষ্টিতে তাঁকে ধরতে হবে— মেকি লোকের পাল্লায় পড়লে সর্বনাশ। কায়মনবাক্যের দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে হবে—

কায়া— শরীরের শুদ্ধি তে আমরা

মন— মনের অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে আনা সাধু সন্ন্যাসীদেরও প্রচুর পরিশ্রম সাপেক্ষ। নির্জনবাসে অতিবাহিত করা— যা সংসারে মোটেই সম্ভব নয়। সংসারী নির্জন বাসে গেলে— সঙ্গে একজন এভাবে প্রতি মুহূর্তে তদারকি করবে— বন্ধন বন্ধন আর বন্ধন। সংসারে সুবিধার কথাও ঠাকুর অনেকবার কথামৃতে বলে গেছে। সংসারে স্ত্রী-পুত্র পরিবার থাকলে— রোগ শোক বিপদে ভাগীদার পাওয়া যাবে। বস্তুত মনকে আত্মবশে আনা খুবই কঠিন কাজ। তবে

হয়ে গেলে সহস্র ক্ষমা ভিক্ষাতেও ফেরানো যাবে না। তাই সাবধান হতে হবে। সৎ কথা মানুষ ভুলে যাবে কিন্তু অসৎ কথার কোনো বিকল্প নেই, সুতরাং বাক্যের দ্বারা প্রার্থনা, বাক্যের দ্বারা ভালোবাসা, বাক্যের দ্বারা আত্মপ্রিয়তা, বাক্যের দ্বারা হিংসা প্রকাশ— অমানবিক হয়ে পড়া— তাই কখন কাকে কি বলবেন— তা বলার আগে ভাবতে হবে। ভাবা দরকার— জিহ্বার সংযমে মানুষকে আপন থেকে আপনতর করে তোলা যায়। নিয়ত সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।

সবাই জানি অথচ অভ্যাসের প্রতি সচেষ্ট নয়। ভাবছেন ভগবান পিতামাতার আশীর্বাদ স্বরূপ পৃথিবীতে এনেছেন, তিনি আমাদের সুস্থ রাখবেনই এটা তার কর্তব্য— আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়েছেন— তা প্রয়োগ না করলেই চলবে—এটা ঠিক নয়। যেমন ধ্যান জ্ঞানের দ্বারা মনকে সততঃ প্রহরায় রাখছি তেমনই শরীরকে যেটা খোলস যেটাকে সারাজীবন বাজাতে হবে সেটা ঠিক সতেজ রাখতে হবে। নচেৎ দারুণ বিপদ— অসুস্থ শরীরে পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। মনকে দ্রুত শরীরে নিয়ে ফেলবে, অতএব শরীরের চালনা শ্বাসপ্রশ্বাসের অনুলোম বিলোম চাই।

তাঁর কৃপা বাতাসে সব অনুকুল হয়ে যাবে। তার জন্য ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা চাই। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলেছেন— ''ঈশ্বর আছেন, তাঁকে পেতে গেলে তোমাকে একান্তে খাটতে হবে। তবে তাঁর অনুকুল বাতাস তোমাকে শীতল করে দেবে। তোমায় আনন্দময় জীবনে পৌঁছে দেবেন।

বাক্য— 'বাক্য' কথাটা উচ্চারণে বিশেষ কষ্ট নেই; কিন্তু বাক্য-নিয়ন্ত্রণ বড়ই শক্তজিনিস। একবার নিঃস্বরণ বা ব্যক্ত হলে সুনিশ্চিত তার ক্রিয়া আছে। বাক্যে প্রয়োগ করা— যথাযথ জায়গায় একটা সাধনা— কোনো অসম বাক্য একটা তীরের মত একবার বহির্গত হলে সারাজীবনের মতো মানুষের চোখের বিষ

তবে জানবেন যদি আপনি সরল স্বাভাবিক জীবনে বিচরণ করেন, তাহলে কোনো ভয় নেই— অদৃশ্য হস্তে স্বয়ং পরমেশ্বরের সতত সাহায্যে ভরপুর হবেনই।

(লেখক যোগন্যাশনাল কোচ)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০্ টাকা

প্রতি কপি ১০্ টাকা।

স্বস্তিকা পাঠকের প্রস্তাব

হিন্দু দৃঢ়-সঙ্ঘবদ্ধকরণ আন্দোলন দ্রুততর বাস্তবায়নের জন্য স্বস্তিকা পত্রিকার একটা বড় ভূমিকা আছে। এই পত্রিকা হিন্দুদের কোথায়, কীভাবে, কী মাত্রায় অত্যাচার, বিতাড়ন ইত্যাদি হচ্ছে তার সংবাদ প্রকাশ করে থাকে। তাই এই পত্রিকাটি অনেক জনপ্রিয় হবার কথা। কিন্তু এই পত্রিকা সম্বন্ধে অধিকাংশ হিন্দু জানে না। স্বস্তিকার পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে, স্টলে স্টলে, বোর্ড বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এর প্রচার করা দরকার। বার্ষিক ৪০০ টাকা দিয়ে বা টাকা পাঠানোর ঝুঁকি, ঝক্কি ভোগ করে হয়তো সকলের পক্ষে গ্রাহক হওয়া সম্ভব হয় না। আমি একজন আই.ডি.এস বা অঙ্গনওয়ারি কর্মী; আমরা পক্ষেও সম্ভব হয় না। এমনকী স্টলে দু-তিন সপ্তাহ আগে নির্দিষ্ট সংখ্যাটি বা নির্দিষ্ট মাসের সব কয়টি সংখ্যা বুক করার সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া তিন মাসের জন্য গ্রাহক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গ্রাহক করার ক্ষেত্রে স্টলের মাধ্যমেই যেন করা যায় তার সুবিধা থাকা দরকার। কোয়াটারলি সাব্‌স্‌ক্রিপ্‌শন্‌-এর ক্ষেত্রে গ্রাহকমূল্য একটু বেশি হলেও গ্রাহকের আগ্রহ কমবে না বলে আশা করা যায়। এছাড়া যে সকল হিন্দু সংগঠন আছে সেইসব সংগঠনগুলিরও স্বস্তিকা পত্রিকাটি প্রোমোট করে অর্থাৎ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে এটি পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করা উচিত। কারণ আমাদের লক্ষ্য হিন্দুজনগণের চোখ খুলে দেওয়া, যার পরিণতিতে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হবেন স্ব-অস্তিত্ব রক্ষা করতে।

আমার মনে হয়, স্বস্তিকার বর্তমান পাঠকগণ আমার সঙ্গে একমত হবেন।

—**সুস্মিতা মণ্ডল,**
ঘোষপাড়া, নদীয়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি

‘উর্দু সমাচারপত্রের স্বীকারোক্তি ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনসংখ্যা’ গত ১৮ মে স্বস্তিকায় মুজফ্‌ফর হোসেন মহাশয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা ২৪ শতাংশ বেড়েছে, হিন্দুদের বৃদ্ধির তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি। আবার মুসলমানদের বৃদ্ধির হারের কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, বেশি বাচ্চা বেশি রোজগারের উপায়। বাজে কথা! দারিদ্র্য শুধু মুসলমানদেরই নেই, হিন্দুদেরও আছে। তা সত্ত্বেও তারা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। তাছাড়া অসংখ্য ধনী উচ্চশিক্ষিত মুসলমান পরিবারে ছয় থেকে ১০টি সন্তান আছে। আসলে বহুবিবাহ নামক অছিলা তাদের সন্তান বৃদ্ধির একটা প্রধান পথ। এর পরেও আছে সীমানা পেরিয়ে এপারে এসে বিয়ে করে সন্তান জন্ম দিয়ে বিবি ফেলে বাংলাদেশে চলে যাওয়া। তাদের দায় ভারতবাসীর উপর এসে পড়ে। কিন্তু আমি বলব ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধির জন্য সরকারই দায়ী সবচেয়ে বেশি। মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে দেশ বা সরকার সুযোগ দিচ্ছে তাই ওরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। ‘নই দুনিয়া’ দিল্লীর সাপ্তাহিক বলেছে ‘দারিদ্র্যের জন্য মুসলমানরা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে না’। জাতীয় স্বার্থে পরিবার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে; দেশ গঠনে হিন্দুরা সাহায্য করবে আর মুসলমানরা তাতে বাধা দেবে তা হিন্দুরা মেনে নেবে কী করে? আসল ব্যাপার হলো, কোরানের নির্দেশ বা মতে পৃথিবীর দুটি ভাগ— দার-উল-ইসলাম, যেখানে মুসলমান শাসন থাকবে আর দার-উল-হার্ব যে সব দেশ বা অঞ্চলে অমুসলমানরা থাকে। দার-উল-হার্বকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা ধর্মীয় কর্তব্য এবং তা রূপায়িত করতে যেখানে যুদ্ধ করে সম্ভব নয় সেখানে জন্মহার বাড়িয়ে এবং অনুপ্রবেশ করে (সুরা ৪, আয়াত ৯৭ এবং ১০০-তে নির্দেশিত) সেই দেশের সংখ্যাগুরুদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে দার-উল-ইসলামে পরিণত করতে হবে। একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, মুসলমান জনসংখ্যার হার সীমান্তবর্তী রাজ্যে (অসম ২৫.২ শতাংশ থেকে দশ বছরে বেড়ে ২৭ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরায়), পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বেশি। এই কারণেই পরিবার পরিকল্পনা না মানাটা শরিয়তের সঙ্গে যুক্ত মুসলমান সমাজ মান্যতা দেয় না। কোথায়? যেখানে দার-উল-হার্ব বিরাজ করে। তা না হলে বাংলাদেশ বহুদিন আগে থেকেই রেডিওতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য মুহুর্মুহু প্রচার করেছে, আজো নিশ্চয় করে থাকে। কেন? কারণ তা না হলে দেশ তার সব নাগরিকদেরকে খাওয়াতে পারবে না, রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারব না। ইন্দোনেশিয়া সাফল্যের সঙ্গে জনবিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ করেছে (বি.বি.সি. লন্ডন কলিং অনুযায়ী)। কারণ ওগুলি দার-উল-ইসলামে রূপান্তরিত করা গেছে।

জামাত ই-ইসলামি পত্রিকা ‘দাওত’-এর মতে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার চলছে। সত্য গ্রহণ ও প্রকাশ যদি ষড়যন্ত্র হয়, তবে ষড়যন্ত্রের শিকার না হওয়ার অধিকার হিন্দুদের আছে।

তবে সবকিছুর বিতর্ক এড়িয়ে ভারতের বাঁচার একটিই রাস্তা খোলা আছে তা হলো বৈষম্যমূলক আইনগুলি উড়িয়ে দিয়ে বেশ কিছু নতুন কঠোর আইন তৈরি করা যাতে দেশের শত্রুদের হয় বিতাড়িত করা যাবে, অথবা দেশের স্বার্থরক্ষাকর আইন মেনে সুবোধ হয়ে বাস করবে। আর সেই জন্য কোরানের প্রকৃত দর্শন ব্যাপক প্রচার করে হিন্দুদের সংগঠিত করা সর্বাপেক্ষা জরুরি।

—**টিমিড পেনস্পিকার,**
কল্যাণী।

একশো দিনের কাজ

মনতোষ বসু

তারিখটা মনে করতে পারছি না। রামগড়ে (পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা) আমার এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম। আমাদের গ্রাম থেকে যে রাস্তাটা দিয়ে রামগড় সহজে যাওয়া যায় সেখানে একটা খাল পড়ে। বর্তমান সরকার এই খালটির ওপর একটি ব্রীজ তৈরি করে দেওয়ার ফলে উভয় পাশের মানুষের খুব সুবিধে হয়ে গেছে। যাওয়ার সময় দেখি খালে ১৫০/২০০ জন মজুর বালি ফেলার কাজ করছে। খালের ওপাশের বালি মাথায় করে নিয়ে এসে জল পেরিয়ে এপাশে ফেলছে। যে ছেলেগুলি কাজ করছিল তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হচ্ছে রে? বোসদা ১০০ দিনের কাজ হচ্ছে। ব্যাস, এইটুকু শুনেই আমি আমার গন্তব্য স্থলের দিকে রওনা হলাম। ৪/৫ দিন পর কাজ সেরে ওই রাস্তা দিয়েই ফেরার সময় দেখছি, যে বালি মাথায় করে এনে খাল পেরিয়ে এপাশে ফেলছিল সেই বালিই আবার মাথায় করে ওপাশে ফেলে দিয়ে আসছে। আমি অবাক হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখছি। সেই সময় স্বপন (যে কাজ করাচ্ছিল) আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল কি দেখছ? আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোদের কী কাজ হচ্ছে? স্বপন উত্তরটা একটু লাজুক ভাবে দিল, ১০০ দিনের কাজতো কোথাও নেই— কী করব বল।

তাহলেই ভাবুন, এ রকমভাবে মহাত্মাজীর নামের ১০০ দিনের কাজের কী পরিণতি! এত এত শ্রমদিবস কেমন ভাবে নষ্ট করা হচ্ছে, দেশের কল্যাণে একটুও লাগছে না। এইরকমটাই কি আমরা চেয়েছিলাম? এই মানসিকতার ওপর ভর করেই কি আমরা বিবেকানন্দের সেই স্বপ্নের ভারত তৈরি করতে পারব?

৩৫ বছর ধরে বাংলার মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল, দেশ-বিরোধী, ফাঁকিবাজি শেখানোর জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে পদ্মভূষণ দেওয়া উচিত ছিল। এরা চাষি ক্ষেতমজুর, মালিক-শ্রমিক, ভাই-ভাই, বাবা-ছেলে সবার সঙ্গে যে কোনো উপায়ে লড়াই লাগিয়ে দু'পক্ষকে দুটি মেরুতে অবস্থান করিয়েছে। মানুষের একাত্মবোধকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। সেই মোরাম রাস্তাটিকেই ঢালাই করে দিচ্ছেন আমাদের মমতা দিদি।

গান্ধীজীর নামের এই কাজ যেটাকে ১০০ দিনের কাজ বলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের একটি প্রস্তাব পাঠকদের কাছে রাখতে চাই।

মনে করা যাক, একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২ জন সদস্য। এঁদের সত্যিকারের কোনো কাজই নেই। এদের কাজের মধ্যে বা দায়িত্বের মধ্যে আনা যাবে কেমনভাবে। সদস্যর কাজ হবে তার Jurisdiction-এ যে সমস্ত চাষি আছেন তারা তাদের জমির পরচার ফটোকপি (অ্যাটেস্টটেড)-সহ একটি দস্তাবেজ তৈরি করে নিজের কাছে জমা রাখবেন।

চাষির চাষ করার জন্য লেবারের প্রয়োজন। সার, লেবার, কৃষিযন্ত্রপাতির দাম দিনকে দিন যেমন বাড়ছে উলটে চাষির উৎপাদিত ফসলের দাম দিনকে দিন কমছে। চাষের প্রতি চাষির একটা অনীহা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। এমতাবস্থায় শ্রমদিবসগুলি বালি এপাশ ওপাশ করে নষ্ট না করে শ্রমদিবসের একটা শতাংশ চাষিদের যাতে কাজে লাগে সেই দিকে বিনিয়োগ করা হোক, কাজটা চাষি নিজে করাবে কিন্তু পেমেন্ট ভায়া ব্যাঙ্ক (জব কার্ড) ক্ষেতমজুর পাবে।

সরকার এরপর ঠিক করুন (দু'ফসলি/তিনফসলি) বিঘাপ্রতি চাষিকে বছরে কটি করে শ্রমদিবস দেওয়া হবে, ২০টি না ২৫টি। আমার বুদ্ধিতে একটু সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করছি এবং এক্ষেত্রে চাষির কীরকম ভাবে চলা উচিত তারও একটু ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

আমি একজন চাষি। আমার তিন ফসলি জমি আছে ১০ বিঘা। সরকার ৩০টি করে মোট বছরে ৩০০টি শ্রমদিবস আমাকে ভরতুকি হিসেবে দেবে কিন্তু কোনো টাকা নয়। এই ৩০০টি শ্রমদিবসের জন্য আমি গ্রামেরই ৩টি পরিবারকে বেছে নেবো। তারাই আমার পুরো চাষের কাজটি করবে। ফলে চাষের প্রতি আমার যে অনীহা আসছিল সেটাও কেটে যাবে। যে তিনটি পরিবার কাজ করছে তাদের ১০০টি করে কাজ বাদ দিয়ে বাকিগুলির মূল্য স্থানীয় স্তরে পেমেন্ট করে দেওয়া হবে এবং ওই ১০০ দিনের কাজের মেনডেট তৈরি করে তা ওই লেবারের হাতে দেবে। লেবার মেম্বারকে দেবে, মেম্বার পঞ্চায়েতে। প্রধান এরপর যা করার করবেন যাতে করে ওই লেবার ১০০ দিনের টাকাটি ব্যাঙ্ক মারফত পান।

১০০ দিনের বাকি কিছু কাজ খরচ করা হোক যাত্রী প্রতীক্ষালয়, প্রস্রাবাগার, স্কুল (প্রাইমারি ও হাইস্কুল) গুলি ঝাঁট দেওয়া, পরিস্কার করার ক্ষেত্রে। গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েতে তৈরি করে দেওয়া প্রস্রাবাগারেই আর কেউ প্রস্রাব করতে পারেন না। স্কুলগুলিতে এক হাঁটু করে ধুলো। যাত্রী প্রতিক্ষালয়ে পোড়াবিড়ি ও ছেঁড়া কাগজে ভর্তি। বাস ধরার লোক বাইরে দাঁড়িয়ে— এই কী সভ্যজগৎ! এই সব কাজগুলিকে ১০০ দিনের মধ্যে রাখা হোক। অপেক্ষাকৃত যারা দুর্বল (শারীরিকভাবে) তাদের দিয়ে পরিকল্পনা করে এই কাজগুলি সারাদেশে করা হয়। এরপর যে সমস্ত জবকার্ডের কাজ বাকি থাকছে যেগুলি পঞ্চায়েতের পুকুর কাটা ইত্যাদি কাজে খরচ করুন।

গোটা প্রোগ্রামটি যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, সেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি পঞ্চায়েত পিছু ১ অথবা ২ জন কর্মী নিয়োগ করবে (অল্প বেতনের বিনিময়ে) যাঁরা সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা ভিত্তিক কাজগুলির গতি আনবেন। তবে ওই কর্মীদের অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষণ বর্গের প্রশিক্ষণ থাকা চাই।

[লেখক কার্যকরী সভাপতি, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, বাঁকুড়া জেলা]

পৌরাণিক নগর
পাণ্ড্য

শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পচর্চায় প্রাচীন গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের সঙ্গে তুলনীয় পাণ্ড্যদের রাজধানী মাদুরাই। হস্তী-পাহাড় ও নাগ-পাহাড়ের মাঝে মাদুরাই অর্থাৎ মধুরম বা মধুরাপুরী বা মিষ্টিস্থান। মিষ্টতা আসে শিবের জটা থেকে পড়া অমৃত থেকে। খৃষ্টের জন্মের ৬০০ বছর আগে ভাইগাই নদীর

গোপাল চক্রবর্তী

পাণ্ড্য দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন নগর। রামায়ণে, মহাভারতে, কাত্যায়নের বার্তিকে, মেগাস্থিনিসের বিবরণে, সম্রাট অশোকের অনুশাসনে, কাব্য মীমাংসায়, টলেমির ভূগোলে পাণ্ড্য নগরের উল্লেখ আছে। পাণ্ড্য রাজ্য কাবেরী নদীর ব-দ্বীপের দক্ষিণে মাদুরাই, তিন্নেভেল্লি জেলা, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ও কোয়েম্বাটোর ও কেচিনের অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত ছিল। পৌরাণিক পাণ্ড্যের রাজধানী ছিল মাদুরাই ও বন্দর ছিল কোরকাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও হিউয়েন সাঙের বর্ণনার উল্লেখ আছে পাণ্ড্য রাজ্যে প্রভূত মুক্তা পাওয়া যেত। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ এই রাজ্যের অধিবাসীদের কৃষ্ণবর্ণ, বিভিন্ন ধর্মী, সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন কিন্তু বাণিজ্যে দক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। স্ট্রাবোর মতে খৃ:পূ: ১ম শতকে পাণ্ড্যরাজ রোমক সম্রাট অগাস্টাসের নিকট দূত প্রেরণ করেন। পাণ্ড্যরাজ্য এক সময়ে কলভ্রগণের অধিকারে আসে। কডুঙ্গোন ও তাঁর উত্তরাধিকারী কলভ্রগণকে বিতাড়িত করেন। অরিকেশরী পরাঙ্কুশ মারবর্মন ও প্রথম রাজসিংহ পল্লব ও চালুক্যগণকে পরাজিত করেন।

দক্ষিণ তীরে ১৩৩ মিটার উঁচুতে পাণ্ড্যরাজা কুলশেখরের নতুন রাজধানী গড়তে বন কেটে নগরের পত্তন করা হয়। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নগর মাদুরাই। উৎসবানুষ্ঠানের নগর বলেও এর খ্যাতি চিরদিনের। ক্রমে ক্রমে মীনাক্ষী মন্দিরকে কেন্দ্র করে পদ্মাকারে প্রসার পেয়েছে এই নগর। এই নগরীর উদ্দেশে বহু চারণ ও কবির উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি-গাথা রচিত হয়েছে। কথিত আছে, দেবী পরাশক্তি এখানে মানবীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কুলশেখর পাণ্ড্যনের পর পাণ্ড্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন মলয়ধ্বজ পাণ্ড্যন। তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি না থাকায় রাজা ও রানী কাঞ্চনমালা সন্তান কামনায় এক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ শেষে ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁরা দেখলেন যে, যজ্ঞকুণ্ড থেকে তিন বৎসর বয়সি ত্রিস্তনী এক বালিকা উদ্ভূত হলো। পরক্ষণেই এক অদ্ভুত দৈববাণী হয় যে ভয়ের কোনো কারণ নেই— এই বালিকা তাঁর দৈবনির্দিষ্ট পতির সাক্ষাৎ পেলেই ওই তৃতীয় স্তন অদৃশ্য হবে। এই শুনে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন ও শিশুটির নাম রাখলেন তজককাই। সানন্দে রাজ-দম্পতি কন্যাটিকে রাজপুত্রের মতই পালন করতে লাগলেন। অল্পদিনেই এই কন্যা সর্বপ্রকার যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। রাজার মৃত্যুর পর

সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেই তজককাই পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজ্য জয় করে রাজ্যবিস্তারে মন দিলেন। ক্রমে স্বয়ং শিবের ভূমি কৈলাস অধিকার করতে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শিবের দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টির মিলন হতেই কন্যার তৃতীয় স্তন অদৃশ্য হলো। তজককাই বুঝলেন এই শিবই তাঁর বিধি-নির্দিষ্ট স্বামী। ভগবান শিব তখন মাদুরাইতে এসে তজককাইকে বিবাহ করলেন ও সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। পরে তাঁদের পুত্র স্বয়ং মুরুগার অবতার উগ্র পাণ্ড্যনের হাতে রাজ্য সমর্পণ করে তাঁরা দিব্যদেহ আশ্রয় করে মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বররূপে বিরাজ করতে থাকেন। দ্বাদশ শতকে সুন্দরপাণ্ড্যনের রাজত্বকালে বর্তমান মীনাক্ষী মন্দিরটি নির্মিত হয়।

পাণ্ড্য রাজা জটিল বর্মন (৭৬৬-৮১৫ খৃ:) পল্লব ও চেরগণকে পরাজিত করেন এবং তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপল্লী, সালেম, কোয়েম্বাটের ও দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুর দখল করেন। পরবর্তী রাজা শ্রীমার শ্রীবল্লভ কুম্ভকোনমে গঙ্গ, পল্লব, চোল, কলিঙ্গ ও মগধের সংযুক্ত সৈন্যদলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেও তেল্লার ও অরিচিতের যুদ্ধে পল্লবদের নিকট পরাজিত হন। চোলরাজ ১ম পরান্তকের নিকট পাণ্ড্যরাজ ২য় রাজসিংহ দারুণভাবে পরাজিত হয়ে রাজ্যত্যাগ করে সিংহলে আশ্রয় নেন।

দশম শতকে চোলদের অধিকারে যায় পাণ্ড্য রাজধানী মাদুরাই। চোলদের পরাজিত করে দ্বাদশ শতকে মহাভারতের পাণ্ডবদের উত্তর-পুরুষ পাণ্ড্যরাজারা আবার মাদুরাই উদ্ধার করেন।

মারবর্মন সুন্দর পাণ্ড্য (১২১৬-৩৮ খৃ:) দ্বিতীয় পাণ্ড্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। জাতবর্মন সুন্দর পাণ্ড্য (১২৫১-৬৮ খৃ:) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি চের, হোয়সল, চোল, কাডব ও সিংহলের রাজাদের পরাজিত করেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য সিংহল থেকে নেল্লোর ও কুদাপ্পা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

চতুর্দশ শতক পর্যন্ত পাণ্ড্যরাজারা মাদুরাই শাসন করেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি মালিক কাফুর মাদুরাই দখল করে। বিজয়নগরের অধীনে ১৩৬৪-তে আবার হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয় মাদুরাইতে। শাসনভার অর্পিত হয় নায়ক প্রশাসকের উপর। ১৫৬৫-তে বিজয়নগরের পতনে স্থানীয় প্রশাসক রাজা হয় মাদুরাই এর। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদুরাইতে নায়ক রাজারা রাজত্ব করেন। নায়ক রাজাদের সময়ে মীনাক্ষী মন্দিরের অনেক সংস্কার হয়। দক্ষিণের শ্রেষ্ঠতম মন্দির, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য মাদুরাইয়ের মীনাক্ষীতে গড়ে ওঠে। এমনকী দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির পীঠস্থানের রূপ নেয় মাদুরাই নায়ক রাজাদের কালে। স্বল্পকালের জন্য (১৭৪০-৪৮ খৃ:) মারাঠাদের দখলে গেলেও নায়কদের হাতে মাদুরাই ফেরে আবার। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে পাণ্ড্যরাজ্য বহু হাত ঘুরে আসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে। বর্তমানে এটি তামিলনাড়ু রাজ্যের অধীন।■

আনুড়ের বিশালাক্ষী বাংলার কামাখ্যা

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

কামারপুকুরের অদূরে, প্রায় চার কিলোমিটার দূরে আনুড় গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষীর স্থান। ধর্মদাস লাহার বিধবা কন্যা প্রসন্ন দেবীর পূজা দিতে চলেছেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন মেয়ে। আছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণও। অবশ্য তখন তিনি কেবল গদাধর। আট-ন' বছর বয়সের বালক। গদাধর সঙ্গে থাকায় মেয়েরা খুশি। ওই বয়সেই দেব-দেবীর মহিমা-বিষয়ক অনেক গান, পাঁচালি তাঁর কণ্ঠস্থ। আর গলাও ভারি সুন্দর। মাঠের আলপথ ধরে চলেছেন সকলে। গদাধর মনের আনন্দে দেবী বিশালাক্ষীর উদ্দেশে গান ধরেছেন। হঠাৎ গদাধরের হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে এল। গান থেমে গেল। সেখানেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন। মেয়েদের দল ভয়ে-ভাবনায় অস্থির। তাঁরা গদাধরের চোখে-মুখে জল দেয়, হাওয়া করে। হঠাৎ প্রসন্নর মনে হলো, তাঁরা যে বিশালাক্ষী দেবীর দর্শনে চলেছেন, তিনি-ই হয়তো আগ বাড়িয়ে চলে এসেছেন, আর আধার পেয়ে আনন্দে অধিষ্ঠিত হয়েছেন গদাধরের অনুদেহে। তাঁর কথায়, সকলে দেবী বিশালাক্ষীর স্তব-স্তুতি শুরু করলেন। প্রসন্ন গদাধরের কানে দিলেন দেবী বিশালাক্ষীর নাম। তাতে কাজ হলো। গদাধরের মুখে হাসি ফুটল, যেন এতক্ষণ কিছুই হয়নি। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে ঠাকুর সেদিন যে আল রাস্তা ধরে গিয়েছিলেন, স্বভাবত তা আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। কামারপুকুরের কলেজ মোড় থেকে আনুড়ের বিশালাক্ষীতলা প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা এখন পিচ রাস্তায় পরিণত হয়েছে। তবে দেবী বিশালাক্ষী স্বমহিমায় অধিষ্ঠান করছেন আনুড় গ্রামে, গ্রামের উত্তর প্রান্তে হাটতলায় তাঁর মন্দির। অবশ্য প্রথমে দেবীর কোনো মন্দির ছিল না। দেবীর বর্তমান স্থানটি ছিল ছোটখাটো একটি জঙ্গল, বট শ্যাওড়া গাছে পূর্ণ। এখনও দু-একটি বড় গাছ আছে।

লোকশ্রুতি, জনৈক মাতৃসাধক দেবীকে কামরূপ

কামাখ্যা থেকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য দেবীর মূর্তি বলতে ইংরাজি 'ভি' আকৃতির ৩.৫ ফুট একটি পাথর। পাথরের মাঝখানে একটি গর্ত। তেল সিঁদুরে চর্চিত। এটি দেবীর যোনিমূর্তি। বাংলায় এরকম যোনিমূর্তির বিশালাক্ষী আর দেখা যায় না। শুধু মূর্তি বিচারে নয়, দেবীর ধ্যানমন্ত্রেও আছে 'কামাখ্যা' কথাটির তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ :

'ওঁ কামাখ্যা বাসলীবালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যা সকলা বিদ্যা কলৌপূর্ণ ফলপ্রদা।।'

বিশালাক্ষী বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় জাগ্রত লোকদেবী। বাংলার বিভিন্ন স্থানে তাঁর পীঠ।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চল ছাড়া হুগলী জেলাতেও অনেক স্থানে বিশালাক্ষীর মনোরম মূর্তি দেখা যায়। যেমন, বেঙ্গাই-এ আছে বিশাল মুণ্ডুমূর্তি, পনেরো ফুট উঁচু, লাল শাড়িতে ঢাকা। সেনেটের বিশালাক্ষী দু'হাত উচ্চতার দুর্গামূর্তি। পালদীঘি গ্রামের বিশালাক্ষী নটরাজের মতো নৃত্যশীল ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। কিন্তু অনুড়ের বিশালাক্ষী স্বতন্ত্র। তাঁর কোনো অবয়ব নেই। তিনি যোনিমূর্তি। সেইজন্য তাঁকে বাংলার কামাখ্যাও বলা যায়।

জনসাধারণের বিশ্বাস দেবী শিশুদের বড় ভালবাসেন। ভক্তরা অনেক সময় দেবীর যোনিগর্ভে যে পয়সা দিয়ে যায় তা গ্রামের শিশুরা হাত ঢুকিয়ে তুলে নেয়; কিন্তু বড়োরা এ কাজ করে অনেক সময় বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছে এমন প্রমাণ আছে।

দেবীর পিছনদিকে আছে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন। প্রতিষ্ঠাতা সাধক নাকি এখানে বসে সাধনা করতেন। তারপর অনেকে বসতে চেয়েছেন, তিষ্ঠোতে পারেননি—এমন কথা চালু আছে। বর্তমানে স্থানটি বিভিন্ন আকারের মাটির সুদৃশ্য ঘোড়া দিয়ে সাজানো। বিশালাক্ষী মাতৃদেবী। তাঁর কাছে জাতপাতের বালাই নেই। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেই দেবীর পূজা দেয়, মানত করে।

বর্তমান শিখরশ্রেণীর কুড়ি ফুট উচ্চতার মন্দিরটি আনুড়ের কৃতী সন্তান বিনয় মুখার্জির তত্ত্বাবধানে ১৪০০ সালে গড়ে উঠেছে। মন্দিরের পাশেই দেবীর পুকুর। পুজোআচ্চার কাজকর্ম এই পুকুরের জলে হয়। ভক্তরা এখানে স্নান করে দেবীর কাছে মানত করে। দেবীর নিত্যপূজা দিনের প্রথম ভাগেই সম্পন্ন হয়। আতপচাল, মুড়কি, চিড়ে ভাজা বিভিন্ন ফলমূল দিয়ে দেবীর নিত্যপূজা হয়।

তবে নিত্যপূজা ছাড়া বার্ষিক উৎসব হয় পৌষ সংক্রান্তির দিনে। স্থানীয় ভাষায় একে 'বড়ো জাত' বলে। 'জাত' অর্থে মেলা। দেবীকে ঘিরে হাটতলায় মেলা বসে। একদিনের মেলা। কামারপুকুর, জয়রামবাটি থেকে এদিন লোকভর্তি ট্রেকার, ট্যাক্সি, ভ্যানরিক্সা আসে। হাটতলা মানুষের সমাগমে ভিড় উপচে পড়ে। দেবীর পুকুরে স্নান, পুজো, মানত, বেচা-কেনার হইচই-য়ে মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। খাওয়া দাওয়া হয়। তারপর বাড়িফেরা, পথধরা। এভাবেই চলে আসছে

বছরের পর বছর ধরে। তবে কবে এর শুরু তা বলা যায় না। ■

পুরাণকথা

নবাঙ্কুর

বাল্মীকি, দুটি বক আর ব্যাধ

পুনর্কথন : দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়

মুনির নাম বাল্মীকি। আশ্রমের পাশে নদী। নাম তমসা। বনের মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে গেছে। ঝকঝকে চেহারা। স্রোত আছে তবে খরস্রোতা নয়। দেখলে মন ভরে যাবে। বাল্মীকি অন্যদিনের মতো সেদিনও বেড়াতে এসেছিলেন নদীর ধারে। এলেই মন ভালো হয়ে যায়। বাল্মীকির ইচ্ছে হলো নদীর জলে

স্নানের। সঙ্গে আছেন শিষ্য ভরদ্বাজ। তিনি গুরুর স্নানের ব্যবস্থার কথা ভাবলেন।

নদীর ধারে দুটো বককে দেখে থমকে দাঁড়ালেন মুনি। প্রকৃতির এই সুন্দর রূপের সঙ্গে মানিয়ে গেছে তারা। পাখি দুটো আপন মনে খেলা করছিল। মুনির চোখে সব মনে হচ্ছিল অপরূপ। তিনি স্নানের কথা ভুলে গেলেন।

চারপাশ যত সুন্দর হোক তার মধ্যে খারাপ লোকজন ঢুকে পড়ে সব শান্তি স্বস্তি নষ্ট করে দেয়। একটা ব্যাধ শিকার খুঁজতে খুঁজতে সেখানে হাজির। বক দুটোকে দেখে তার আনন্দ ধরে না। বক দুটো এত আনন্দে ছিল যে কোনোরকম বিপদ যে আসতে পারে তা ভাবেনি। কোনোরকম জানান না দিয়ে ব্যাধটা তীর ছুঁড়ল দুটোকে মারার জন্যে। তীর লাগল পুরুষ পাখিটির গায়ে। সে ছটফট করতে লাগল যন্ত্রণায়। মেয়ে পাখিটি তখন কাঁদতে লাগল। শোকে কাঁদছিল ভয়ে কাঁপছিল। মুনি চোখের সামনে এমন কাণ্ড দেখে সহ্য করতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে তীরবিদ্ধ পাখিটিকে কোলে তুলে নিলেন। তীর বের করে দিলেন। কিন্তু তার জীবন শেষ হয়ে আসছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুনির গা। তিনি ব্যাধকে বললেন, 'তুই এটা কি করলি নিষ্ঠুর। ওরা আনন্দে খেলা করছিল। লোভে মেরে ফেললি! 'তোর এই খারাপ কাজের ফল তুই পাবি।'

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বমগমশাশ্বতীসমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধি কামমোহিতম্।।'

মুনির চোখের জলের সঙ্গে বেরোতে লাগল তাঁর মনের কষ্ট। কথাগুলোর মধ্যে আপনা থেকেই এসে গেল ছন্দ। দুঃখের মুহূর্তে সৃষ্টি হলো মুনির কথা অন্যভাবে। যা রূপ নিল কবিতায়। এই প্রথম কবিতা। এর আগে কেউ কোনোদিন কবিতা রচনা করেনি। মুনি নিজেও অবাক। বললে, এসব কথা আমিই বললাম! আমার তো ছন্দটন্দ কিছুই জানা নেই, কিন্তু এই কথাগুলোর মধ্যে যেন হৃদয়ের গভীরে ওঠা ধ্বনিতরঙ্গে বাজনা বাজছে। বীণা বাজছে। সমান সমান অক্ষর এর মধ্যে। একে শ্লোক বলা যাক। আমার শোকের সময় আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ভরদ্বাজ বললেন তখন, 'গুরুদেব। এমন সুন্দর কথা আগে কেউ কখনও বলেনি। শ্লোকই বলা হোক একে।'

মুনি স্নান করতে গেলেন। তাঁর মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে পাখি ও সুন্দর ছন্দের কথা। অন্য কোনো ভাবনা এলো না। ওই সময়ে ব্রহ্মা এলেন সেখানে। মুনির ভাবনার মধ্যে শুধু পাখি দুটি। ব্রহ্মাকে দেখেও অন্য কথা বলার কথা ভাবলেন না। মন জুড়ে এক ভাবনা। মুনি সমস্ত ঘটনা ছন্দে গান গেয়ে শোনালেন।

ব্রহ্মা বললেন, 'শোনো বাল্মীকি, তোমার এই কবিতার নাম শ্লোক হোক। তুমি শ্লোকের মাধ্যমে রামের কথা লিখ। তুমি যা লিখবে তাই হবে সত্যি। এই রামকথার জন্যে তুমি কালজয়ী হয়ে থাকবে।'

ব্রহ্মা বিদায় নেওয়ার পর, বাল্মীকি ভাবতে থাকলেন, 'আমি এই শ্লোক দিয়ে রামায়ণ রচনা করবো। এটাই হবে আমার কাজ।' এরপর শুরু হলো রামায়ণ রচনার কাজ। একসময় শেষ হলো। মুনি ভাবলেন, 'রচনা তো হলো। কে গাইবে এই রামায়ণ গান। ততদিনে কুশ আর লব নামে দুই ভাই আশ্রমে একটু বড়ো হয়েছে। মুনির মনে হলো, 'এরাই রামায়ণ ঠিকমতো গাইবে।' বালক দুটি দেখতে সুন্দর। কণ্ঠস্বর চমৎকার। দুই ভাইকে বাল্মীকি রামায়ণ গান শেখালেন যত্ন করে।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

ফিরে পড়া

ভারতের পুণ্যাশ্রম

নবীনচন্দ্র সেন

(১৮৪৭-১৯০৯)

ভারতের পুণ্যাশ্রম, মহাতীর্থ সব।
ঝড়পূর্ণ জগতের শান্তির নিবাস।
সংসার-সমুদ্রেতীর! আকাঙ্ক্ষা-লহরী—
অনন্ত অসংখ্য—নাহি প্রবেশে হেথায়।
নাহি ফলে হেথা কভু সুখ দুঃখ ফল
বিষয়-বাসনাবৃক্ষে; নাহি ফুটে ফুল
পাপের কণ্টকবৃন্তে চিত্তমুগ্ধকর।
নাহি হেথা সুখদুঃখ, শান্তিতে বিষাদ,
প্রেমেতে স্বার্থের ছায়া, দারিদ্র্যে দহন।
ভারতের তপোবন! পাপ ধরাতলে
স্বরগের প্রতিকৃতি! কয়টি নক্ষত্র
আঁধার ভারতাকাশে, জ্ঞানের আলোক
ঘোর মূর্খতা আঁধারে! নীরব, নির্জন,
এই তপোবন হতে যখন যে জ্যোতিঃ,
পার্থ! হয় বিনির্গত, সমস্ত ভারত
ঝাঁপ দেয় তাহে, ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো।
ধর্মনীতি, রাজনীতি, নীতি সমাজের,
যে যে মহামন্ত্রবলে হতেছে চালিত
সমস্ত ভারতবর্ষ, সকলি—সকলি—
নীরব নির্জন এই আশ্রমপ্রসূত।

প্রশ্নবাণ

১. আমাদের দেশে চিকিৎসক দিবস কবে? ওইদিনটি চিহ্নিত করা হয়েছে কোন্ বিখ্যাত মানুষের নামে? তাঁর জন্ম-মৃত্যু কবে?

২. রবিশঙ্কর কোন্ বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন? তাঁর দাদার নাম কি? তিনি কি জন্যে বিখ্যাত?

৩. কে কোন্ ক্ষেত্রে বিখ্যাত—রমাপদ চৌধুরী, মৃণাল সেন, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

৪. সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' ছবির কাহিনিকার কে?

৫. আদর্শ হিন্দু হোটেল, নাগিনী কন্যার কাহিনী, পুতুল নাচের ইতিকথার লেখক কে কে? তাদের পদবি?

উত্তর : ১. ১ জুলাই। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ১ জুলাই। ২. সেতার। উদয়শঙ্কর। নৃত্যশিল্প। ৩. সাহিত্যিক। চলচ্চিত্র পরিচালক। চিত্রকর। অভিনেতা। ৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ৫. বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশেপাশে

রঞ্জন স্যার ও ছোটরা

রঞ্জন-স্যার পরের মাস থেকে আর আসবেন না— এটা স্কুলের সব ছেলে জেনে গেছে। তিনি অন্য একটা স্কুলে চলে যাচ্ছেন। স্কুলটা অনেক দূরে। সকলেরই মন খারাপ। রঞ্জন স্যার ছাত্রদের স্নেহ ভালোবাসায় জড়িয়ে রেখেছিলেন। তাদের জন্যে ভাবতেন। প্রত্যেকের নাম জানতেন। তাঁর কাছে গিয়ে যে কোনো সমস্যার কথা বললে মন দিয়ে শুনতেন। ছাত্রদের পাশে থাকতেন বলে ছাত্ররা তাঁকে আপন ভাবত। তার পড়ানোর মধ্যে ছিল যত্ন আর শ্রম। ছোটদের গড়ার কাজ মন দিয়ে করা দরকার— এটা মানতেন সবসময়। যে সব ছেলের বাড়ির অবস্থা ভালো নয় তাদের জন্যে নিজের টাকা খরচ করে বই খাতা কিনে দিতেন। তাদের পড়িয়ে দিতেন ছুটির পরে। কখনও টিউশনি করতেন না। বই কিনতেন বই পড়তেন। বই উপহার দিতেন। তার কাছে বই উপহার পেয়েছে অনেক ছেলে।

স্যার বললেন এক একটা ক্লাসে, তোমরা অনেক ভালো পড়াশোনা করবে। সবকিছুতে এগিয়ে যাবে— এটাই আমি চাইবো। আমার প্রতিটি ছাত্র ভালো একথা বলতে পারি। অনেক কাজ আছে, শেখার জানার রয়েছে। মনের জানালাগুলো খুলে রাখো চারপাশ থেকে আলো আসুক— একথা আমাদের দেশের মনীষীরা বলে গেছেন। আমি সে কথা তোমাদের মনে করিয়ে দিই। আমিও মনে রাখি।

ছেলেরা একে একে এসে প্রণাম করল। অনেকেরই চোখে জল। রঞ্জন স্যার অনেক কষ্টে নিজের চোখের জলকে আটকে রাখলেন।

বইমিত্র

মাতৃভক্তি বনাম মাদার্স ডে

সুতপা বসাক ভড়

'মাতৃভক্তি' শব্দটির সঙ্গে আমরা আদি শঙ্করাচার্য, শিবাজী মহারাজ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহাপুরুষকে পৃথক করতে পারি না। এঁদের দৃষ্টান্ত ছোটবেলা থেকে শুনে, পড়ে, ব্যাখ্যা করেই জীবন গঠনের পথে অগ্রসর হই আমরা। হঠাৎ করে মাদার্স ডে শব্দটিতে একটা ভালোমতো ধাক্কা লাগে আমাদের। ওই নির্দিষ্ট দিনটিতেই মাকে বিশেষভাবে কেন যত্ন করব, উপহার দেব বুঝে উঠতে পারি না। ওই বিশেষ যত্ন বা উপহার কোনোটিই আমাদের মায়েদের কাছে অভিপ্রেত নয়। মা মানে শুধুই মা। দিতেই জানেন, কিছু আশা করেন না। পরিবর্তে ওই বিশেষ দিনে আমরা সুন্দর একটা উপহার কিনে একটু খোঁজখবর নিয়ে সারাবছরের দায়িত্ব মিটিয়ে দিলাম। আবার অপেক্ষা করে থাকব কবে আগামী বছরের মাদার্স ডে আসবে, তখন ভাবব মা'র কথা। কষ্ট হচ্ছে না ব্যাপারটা ভাবতে?

আসলে মেকলে সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এখনও পুরোপুরি সাহেব হয়ে উঠতে পারিনি। সেজন্য জন্ম থেকেই আমরা মা-মা শুরু করি। আমরা হলাম মা-নেওটা। বয়স হলেও আমাদের মাকে চাই-ই চাই। আমাদের মায়েরা আয়া বা ন্যানির ভরসায় আমাদের জন্ম দেন না। তাই যতই নোংরা করি না কেন, সব পরিষ্কার করে আবার কোলে নিয়ে আদর করবেন। একটু একটু করে খাওয়ানো, চলা শেখানো, কথা বলানো, তারপর প্রাথমিক পড়াশুনা তো মাকে ছাড়া ভাবাই যায় না। আমাদের যত আবদার, অত্যাচার সবকিছু মা'র কাছে। স্কুলে যাবার সময় মা, ফিরে এসে মা। বাড়িতে মা নেই ভাবলেই কান্না পেয়ে যায়। বয়ঃসন্ধির সমস্যা সমাধানের জন্য মা। মার কাছে সব সমস্যার সমাধান আছে। মা'র হাতের রান্নার স্বাদ পৃথিবীতে কোনো রাঁধুনি যে আনতে পারবে না একথা হলফ্ করে বলা যায়। আবার মার মতো সুন্দরী রমণী ভু-ভারতে কেউ কোথাও খুঁজে পাবে না। তাই আমাদের এই ৩৬৫ দিন, ৩৬৫ × ৬০ মিনিট, ৩৬৫ × ৬০ × ৬০ সেকেন্ডের মাকে আমরা মাদার্স ডে'র অভিনন্দন জানাতে পারব না। দরকার নেই আমাদের মাদার্স ডে'র। মাদার্স ডে ছাড়াই আমরা আমাদের মাকে নিয়ে খুশি আছি, মা'র ব্যাপারে সাহেবদের নাক না গলালেও আমাদের চলে যাবে, বরং ধন্য হব।

বৃদ্ধাবস্থায় মা'র প্রত্যহ নদীস্নানে যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য আদি শঙ্করাচার্য যোগবলে নদীর স্রোত পরিবর্তন করে কুটীরের কাছে নিয়ে যান। মা'র নির্দেশ এবং আদেশ পালন করে হিন্দু পদপাদশাহী স্থাপনা করেন শিবাজী মহারাজ। মা'র আহ্বানে বর্ষার রাত্রে উত্তাল দামোদর নদ সাঁতার কেটে পার হন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মা'র সেবা এবং আদেশ পালনের জন্য মাদার্স ডে'র অপেক্ষায় তাঁরা কেউ বসে থাকেননি। বিদ্যাসাগর তাঁর মা ভগবতী দেবীকে অলঙ্কার উপহার দিতে চাইলে তিনি খুব খুশি হন। ছেলেকে ডেকে বললেন, ওই অঞ্চলে বহু গরিবের বাস। শীতকালে তাদের বড়ো কষ্ট, ঈশ্বরচন্দ্র যেন ওদের সবার জন্য শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা করে। নিজ সন্তানের থেকে নেওয়া এই হলো তাঁর অলঙ্কার। পরবর্তীকালে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে 'দানসাগর' নামেও পরিচিত হতে দেখি। এই মহৎ গুণটি তাঁর মধ্যে এসেছিল তাঁর মা'র শিক্ষা থেকে। মাদার্স ডে'র আয়োজকদের এ ব্যাপারে কিছু বলার নেই।

শৈশবে মাতৃহারা রবীন্দ্রনাথ মাকে খুঁজে ফেরেন ঠাকুর পুজোর আয়োজনে, শিউলি ফুল ফোটার মধ্যে। শরতের আকাশে তিনি খুঁজে পান তাঁর মা-কে। মা যেন অনেক দূরে চলে গিয়েও আকাশ বিস্তৃত নয়নে স্নেহদৃষ্টি মেলে রয়েছেন শিশু রবির পানে। মা'র প্রতি এই টান, ভালবাসা— একি নিক্তিতে মাপা যায়? শিশু-সন্তান মাকে ছাড়া থাকতে পারে না, নির্ভরশীল সে মা'র ওপর— তারপর সেই সন্তান যখন বড় হয়, তখন তার অবচেতন মনে সর্বদা মনে হয় মা'র কোনো কষ্ট তো হচ্ছে না? মাকে একটু সুখ দিতে পারলে কৃতার্থ হয় সে। তার জীবনে ছেয়ে আছে তার মা। মা'র সুবিধা-অসুবিধা তার কাছে সর্বোপরি। ধন্যি সাহেবরা, তোমরা তো তোমাদের মাকেও সেলিব্রিটি বানিয়ে দিলে!

তবে একটু কৌতূহল হচ্ছে, কোন্ মা'র জন্য মাদার্স ডে পালন কর তোমরা? Real mother, step mother, biological mother না আরও কোনো mother-এর জন্য? ▮

বেশির ভাগ মানুষের কর্মসংস্থান কীভাবে হওয়া সম্ভব এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বিরোধীদের তুমুল সমালোচনা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে 'আচ্ছে দিন'-এর স্বপ্ন পূরণের আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি এক বছর পূর্ণ করেছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। এনডিএ সরকারের একবছর পূর্ণ হওয়ার পর বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের এডিটোরিয়াল ডাইরেক্টর শ্রীরাম যোশীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশবাসীকে সুদিনের আশ্বাস দিতে গিয়ে গরিব, কৃষক, শ্রমিক, বেকার যুবকদের সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি পাকিস্তান সম্পর্কে নিজের মত পেশ করেছেন নরেন্দ্র মোদী।

▯ এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর গোটা দেশে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। যা আপনারই কৃতিত্ব। এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

▯ ৩০ বছর পর দেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সরকার গড়ার পেছনে কোটি কোটি দেশবাসীর চিন্তাভাবনা এবং তৎকালীন পরিস্থিতি কাজ করেছে। চারিদিকে হতাশা গ্রাস করেছিল। দুর্নীতির খবর প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছিল। সরকারের অস্তিত্ব অনুভূত হোত না। আজ দেশবাসী গর্বের সঙ্গে বলতে পারছেন যে, আমরা কম সময়ে হতাশাকে আশায় পরিণত করতে পেরেছি। একটা সময় ছিল যখন চর্চা হোত, সরকার নেই। আজ চর্চা হয় সরকার সবার আগে পৌঁছে যায়। একটা সময় ছিল যখন প্রতিদিন দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে আসত। আজ একটা বছর কেটে গেল, আমাদের রাজনৈতিক বিরোধীরা দুর্নীতির কোনো অভিযোগ করতে পারেননি।

ভারতের প্রতি বিদেশি বিনিয়োগকারী ও সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক অথবা আন্তর্জাতিক আর্থিক সংগঠন সবাই একই সুরে ভারতের অর্থব্যবস্থার সঠিক দিককে স্বাগত জানিয়েছে। যেভাবে একের পর এক কাজে সফলতা মিলছে, সেভাবেই একের পর এক ভালো কাজের পরিণামও মিলছে। জনতার আশীর্বাদ ও ভালোবাসা দিনের পর দিন বাড়ছে, আর ঠিক তাই কাজ করার আগ্রহও বেড়ে যাচ্ছে।

▯ আপনার সরকারের দ্বিতীয় বছরের লক্ষ্য কি?

▯ দেশের আর্থিক বিকাশ কিসের উপর নির্ভরশীল? জমি থেকে অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করা যায় কিনা, এটাই প্রথম আর্থিক বিকাশের ভিত্তি। দ্বিতীয় হলো, আমাদের

নিজ খনিজ সম্পদ থেকে আরও কিছু তৈরি করা সম্ভব কিনা। এবং তৃতীয়, আর্থিক বিকাশ যুবশক্তির উপর নির্ভরশীল। যার বুদ্ধি, বল এবং পরিশ্রম দেশের পরিবর্তনের জন্য অতিআবশ্যক। আমাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যদি এই তিন বিষয়কে এক সূত্রে সঠিকভাবে রাখা যায় তবেই দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব।

ভারত একটি যুব দেশ। বেশিরভাগ মানুষের কর্মসংস্থান কীভাবে হওয়া সম্ভব এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমরা নয়া উদ্যোগ চাই। যেমন কৃষিক্ষেত্রে কীভাবে ভ্যালু এডিশন হওয়া সম্ভব, যার দ্বারা কৃষকরা অধিকভাবে লাভবান হবেন। কৃষির উপর নির্ভর শিল্পের নেটওয়ার্ক কীভাবে তৈরি করা যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্র হলো, আমাদের যে খনিজ সম্পদ রয়েছে তাতে মূল্যবৃদ্ধি কীভাবে হবে। আমরা কাঁচামাল বিদেশে পাঠাবো, নাকি কাঁচামাল দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করে তা বিদেশে পাঠাবো। এভাবেই আমাদের খনিজ সম্পদের দ্বারা মূল্যবৃদ্ধি হোক।

আমাদের চেষ্টা হলো লোহা যেন দেশ থেকে বাইরে না যায়। আমাদের সুতির কাপড় বিশ্ব বাজারে পৌঁছে রেডিমেড পোশাক ও ফ্যাশনের রূপ নেয়। এটা কি আমরা দেশে করতে পারি না, যার দ্বারা যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়? আমরা আর কতদিন পিছিয়ে থাকবো? আমাদের দরিদ্ররা কতদিন ঘরের বাইরে থাকবে? গরিবদের ঘর দেওয়া দেশের কর্তব্য। যদি দেশে কোটি কোটি ঘরবাড়ি তৈরি হয়, তবে কোটি কোটি যুবকদের রোজগারও মিলবে।

ভারতীয় রেল হলো গরিবদের সম্বল। যদি দরিদ্র মানুষদের জন্য কিছু করতে হয় তবে রেলকে উপেক্ষা করলে চলবে না। কারণ দরিদ্ররা ট্রেনে যাতায়াত করেন। আমাদের রেল পরিচ্ছন্ন নয়। রেলের সময়ের কোনো ঠিক নেই। এমন কতদিন চলবে? আমরা রেলকে আধুনিক করতে চাই। রেলের মাধ্যমে রোজগার বাড়িয়ে আমরা গরিবদের সহায়তা করতে চাই।

□ জমি অধিগ্রহণ বিল সম্বন্ধে বিরোধীদের কীভাবে বোঝাবেন? বিরোধীরা তো আপনাকে কৃষক-বিরোধী প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

□ দেশবাসীর কাছে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই যে, যারা এই মিথ্যে অপপ্রচার করছে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, ভারত সরকারের কাছে কি জমি থাকে? সবাই জানেন জমি রাজ্য সরকারের কাছে থাকে। সবাই জানেন কার্যালয় তৈরির জন্য ভারত সরকারকে রাজ্য সরকারের কাছে জমি চাইতে হয়। রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে সত্যিটা মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে না। যেমন, জমি অধিগ্রহণ বিল দ্বারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি নিয়ে নেওয়া হবে, এই মিথ্যে অপপ্রচারের জন্য আমাদের বিরোধীরা দিন রাত এক করে তুলেছে। আমরা যা সংশোধন এনেছি তাতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি জমির জন্য এক ইঞ্চিও সুবিধা পাবে না। পুরোপুরি মিথ্যে অপপ্রচার চলছে। আমার বিশ্বাস, নিরপেক্ষ মানুষ যখন সত্যি জেনে যাবেন তখন স্বার্থপর রাজনৈতিক শক্তিরা ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। কৃষকরা এই নতুন বিলের দ্বারা নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। আগের জমি অধিগ্রহণ আইনে বদল আনা ভারতীয় জনতা পার্টি অথবা আমাদের সরকারের অ্যাজেন্ডা ছিল না। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যের সরকারের পক্ষে আগ্রহপূর্বক আর্জি জানানো হয়েছিল যে, ভারত সরকার এই আইনে পরিবর্তন আনুক। রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন দলের সরকার রয়েছে। আমাদেরও চিন্তায় এসেছে যে, খুব তাড়াহুড়োয় তৈরি হওয়া ২০১৩-র আইনে কৃষক বিরোধী ও উন্নয়ন বিরোধী যে বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলি ঠিক করে কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা উচিত।

নতুন বিল দ্বারা আমরা যে পরিবর্তন আনতে চাই, যদি তা না আনতাম তবে কৃষকদের জন্য সেচব্যবস্থা অসম্ভব হয়ে যেত। গ্রামে কৃষকরা পাকা রাস্তা পেতেন না। গ্রামে গরিবদের জন্য ঘর হোত না। এই কারণে গ্রামের বিকাশের জন্য, কৃষকদের ভালোর জন্য আইনের অভাব দূর করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। আর যে রাজ্যগুলি চেয়েছিল তাদের চাহিদা পূরণ করে আমরা কৃষকদের জন্য একটি পবিত্র এবং সৎ প্রয়াস করেছি। আমার বিশ্বাস যে, আগামী দিনে মিথ্যের পরাজয় হবে এবং জেনেশুনে রটানো ভুল ধারনা থেকে মুক্তি পাবে দেশ।

□ রাজ্যসভায় এনডিএ-র দুর্বল অবস্থা সরকারকে চিন্তায় রেখেছে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো চিন্তাধারা আছে আপনার?

□ আমার মতে যাঁরা দেশের ভালো চান তাঁদের মনে এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। কিন্তু এ জন্য সরকারকে কাঠগড়ায় রাখার যে পরম্পরা চলে আসছে তা সঠিক নয়। আমরা সবাই খুব ভালো ভাবেই জানি, রাজ্যসভায় আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। আমরা এটাও জানি যে রাজ্যসভায় যে সমস্ত দল আছে তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক চিন্তাধারা রয়েছে। এজন্য সরকারের প্রচেষ্টা হলো এই পরিস্থিতিতেও সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে রাস্তা বের করা এবং দেশের উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়া। আমি খুব খুশি যে এই অল্প সময়ে ৪০ এর বেশি বিল পাশ করা সম্ভব হয়েছে। আর এজন্য আমি বিরোধীদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাদের সবার প্রচেষ্টা এটাই থাকা উচিত যে, লোকসভায় যে সমস্ত ভাবনাকে সামনে আনা হয়েছে রাজ্যসভাও সেই সমস্ত ভাবনাকে স্বাগত জানিয়ে দেশের উন্নয়নে সহায়তা করুক।

□ বিদেশে আপনাকে নিয়ে খুব আলোচনা হয়। আপনার কথা শোনার জন্য মানুষ উদগ্রীব। কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে আপনার কিছু কথায় (যেমন— দেশের মানুষ আগে ভারতীয় হওয়ার জন্য অপমানিত বোধ করতেন) অনেকেই অসন্তুষ্ট হতে পারেন?

□ আমার মতে নিজের আত্মবিশ্বাস না বাড়লে বিশ্বে উঁচু স্থান পাওয়া অসম্ভব। আত্মবিশ্বাস তখনই বাড়ে যখন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সুচারু হয়। আমরা জানি একবিংশ শতকের শুরুতে ভারতের কাছে গোটা বিশ্বের অনেক আশা ছিল, কিন্তু গত একদশকে গোটা বিশ্বে ভারতের প্রতি নিরাশার ছায়া নেমে এসেছে। এমনই সময় আমি আমার সরকারের দায়িত্ব পেলাম। আমি জানতাম চ্যালেঞ্জটা অনেক কঠিন।

বিশ্ব আমার কাছে নতুন, আর আমিও বিশ্বের কাছে নতুন। এখন বিশ্বে ভারতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাক, তা আবশ্যিক। আর এই কারণে আমি এই চ্যালেঞ্জ স্বীকার করেছি—নিজেই যাবো। গোটা বিশ্বকে ভারতের প্রতি, তার শক্তি এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে জানাবো। দেশের দুর্ভাগ্য হলো এই যে, জানা অজানায় নিজেদের খারাপটা লোকের কাছে বলা এখন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের দেশের নেতিবাচক ছবি বানানোর জন্য কোনো সুযোগই হাতছাড়া করা হয় না। এই অদ্ভুত ফ্যাশনের কারণেই আমরা আমাদের দেশের আত্মগৌরবকে আঘাত করছি।

এখনও কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে আমাদের দেশের সম্বন্ধে নেতিবাচক কথা বলা হলেও তারা আনন্দ পায়। এমন ধরনের মানুষের মুখোশ সকলের সামনেই পরিষ্কার।

আজ আমার এটাই আনন্দ যে, বর্তমানে ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা ইতিবাচক হয়েছে। এই সফলতার পেছনে আমাদের সরকারের নীতি, প্রচেষ্টা এবং দেশবাসীর বড় ভূমিকা রয়েছে। ৩০ বছর পর পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গড়েছে দেশবাসী। ফলে নির্ণায়ক সরকারের ছবি থাকার কারণে বিশ্বাস জন্মানোর ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে। প্রত্যেক ভারতীয় এই কারণে গর্ব করতে পারেন যে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের পক্ষে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের জন্য প্রস্তাব রাখা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইতিহাসে এই প্রথমবার বিশ্বের ১৭৭টি দেশ সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে। এমনকী শুধুমাত্র ১০০ দিনে এই প্রস্তাব স্বাক্ষরিত হয়। ভারতীয়দের কাছে তা অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

□ পাকিস্তান সম্বন্ধে আপনার কি মতামত? ভবিষ্যতে কি আপনি পাকিস্তান সফরে যাবেন?

□ পাকিস্তানের কাছে আমার একটাই আশা যে, তারা শান্তি ও অহিংসার পথে চলুক। হিংসা করে আমাদের বা পাকিস্তানের কারও কোনো লাভ হবে না। পাকিস্তান সফরে গিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। পাকিস্তান এবং ভারত দুই দেশকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিজেদের মধ্যে লড়াই না করে দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করলে দেশের ভালো হবে।

□ ভারতের কৃষিক্ষেত্রে চলতি সঙ্কট দূর করবেন কি করে? এ জন্য কোনো চিন্তাধারা আছে সরকারের?

□ দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এই যে স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরেও ভারতের শুধুমাত্র ৪৫ শতাংশ জমিতেই সেচ ব্যবস্থা আছে। বাকি ৫৫ শতাংশ বর্ষার উপর নির্ভরশীল। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৃষিকে বৈজ্ঞানিক এবং আধুনিক করার উপর জোর দেওয়া উচিত ছিল। সঠিক সময়ে এটা হওয়ার দরকার ছিল। পরিবার বাড়ছে বলেই জমিগুলি টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। কৃষিকাজের জন্য খরচও বাড়ছে। একটা সময় ছিল যখন ভারতের উন্নয়নে কৃষকদের যোগদান ৬০ শতাংশ ছিল। এখন সেই পরিমাণ মাত্র ১৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। খেত মজুরদের নিয়ে তো কেউ কোনো কথা বলে না। এই কারণে ভারতের কৃষিকে আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নীত করতে হবে। প্রতি একরে উৎপাদন কি করে বাড়বে? যাতে কম জমিতেও কৃষকরা বেশি লাভবান হয়। আমরা 'সোয়েল হেল্‌থ কার্ড' শুরু করেছি। যাতে কৃষকরা জমিতে কম বিনিয়োগ করে বেশি উৎপাদন করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনা-র দ্বারা সেচ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার প্রচেষ্টা চলছে। ইউরিয়াতে নিমের কোটিং করা হয়েছে যাতে কৃষকরা যে ইউরিয়া পাবে তা ব্যবসায়ীরা বিক্রি করতে না পারে। কৃষকদের আবহাওয়া ও বাজার দর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার জন্য কৃষাণ চ্যানেল খোলা হয়েছে। এই সব প্রচেষ্টার দ্বারা লাভবান হবেন দেশের কৃষকরা।

□ স্বচ্ছতা অভিযান এবং গঙ্গা পরিষ্কার অভিযানে সারা দেশ আপনার পাশে। এভাবে আগামী দিনেও যাতে চলতে থাকে এবিষয়ে জনতাকে কিছু বলতে চান?

□ আমরা যখন ২০১৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ জন্মবার্ষিকী পালন করবো তখন স্বচ্ছ ভারত দিয়ে আমরা বাপুকে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পারবো। যাঁরা গান্ধীজীকে দেখেছেন বা তাঁর সম্বন্ধে পড়েছেন তাঁরা জানেন স্বচ্ছতা এমনই একটি বিষয় যা গান্ধীজীর কাছে প্রিয় ছিল। স্বচ্ছতার সঙ্গে তিনি কখনও আপোশ করতেন না। স্বচ্ছতার প্রতি গান্ধীজীর এই সমর্পণকে আমাদের ব্যবহারের মাধ্যমে গোটা দেশকে জানাতে হবে। আমি প্রথম থেকেই বলে এসেছি দেশবাসীর সাহায্য ছাড়া স্বচ্ছ ভারত অভিযান সম্ভব নয়। আমাদের ঘর-বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আমরা যেখানে কাজ করি সেই জায়গা পরিষ্কার রাখতে হবে। বিশেষ করে রেল স্টেশন, বাসস্টপ, হাসপাতাল এবং বিদ্যালয়ের মতো জায়গা যাতে পরিষ্কার থাকে সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।

আমি শুরু থেকেই বলে এসেছি আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিককে সংকল্প করতে হবে আমরা নোংরা করবো না এবং করতেও দেব না। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আমি এটাই বলতে চাই যে আপনাদের একটি প্রচেষ্টা দেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ হবে। ঠিক একই ভাবে গঙ্গা দূষণের জন্য মানুষই দায়ী। আমরা এমন কোনো কাজ করবো না যাতে আমাদের পবিত্র গঙ্গা দূষিত হয়।

□ আপনার জীবনযাপন সম্বন্ধে সবাই অবগত। সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠেন ও রাত একটা নাগাদ ঘুমোন। কাজের এত চাপ কীভাবে সামলান?

□ কাজ করে যদি সফলতা উপলব্ধি হয় তবে কাজ করে কষ্ট হয় না। কাজ পুরোপুরি সফল হলে মানসিক চিন্তা হয় না। কাজ অর্ধেক ফেলে রাখলে মানসিক চিন্তা হয়। এই কারণে আমি অভ্যেস করেছি কাজ সম্পূর্ণ করেই বিশ্রাম নেব। এই কারণে বিশ্রামের জন্য অল্প সময়ই যথেষ্ট। আমি সবাইকে বলতে পারি কোনো কাজ ছোট কিংবা বড় নয়।

□ আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

□ ধন্যবাদ। ❚

বিশেষ নিবন্ধ

এক দেশদ্রোহীর জবানবন্দী

শশাঙ্ক ভূষণ মিত্র

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য এক দুর্লভ মানুষ। ১৯১৬ সালে ফরিদপুর জেলার জঙ্গল গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শশিকান্ত, মাতা রাঙা বউ। মায়ের নামটি আসল নয়। পরিবারের সদস্যরা ফর্সা রঙের প্রশংসার জন্য এ নাম দিয়েছিলেন। আবুল হোসেন একুশ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সম্প্রতি তাঁর একটি বই 'আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম' পড়ার সৌভাগ্য হলো। ভদ্রলোকের সুদুর্লভ চরিত্র উদ্ভাসিত হলো। এমন স্বজাতি-স্বদেশ-স্বধর্ম বিদ্বেষী মানুষ খুব বেশি পাওয়া যায় না। আবুল হোসেনের পিতৃদত্ত নাম সুদর্শন। নামটি অস্বীকার করলেও পৈত্রিক পদবি তিনি ত্যাগ করেননি। লক্ষ্য একটি বিষয় প্রতিষ্ঠা। তাঁর ভাষাতে লিখছি :

"যারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে থাকেন তাঁদের সকলেই হিন্দু জাতির তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত বলে একশ্রেণীর হিন্দু লেখক ও বুদ্ধিজীবী অপপ্রচার চালিয়ে এসেছেন। তাঁদের প্রতারণা যে সর্বাংশে সত্য নয় তা প্রমাণ করার জন্যে আমি নামের শেষে 'ভট্টাচার্য' পদবি ব্যবহার করি একান্ত বাধ্য হয়েই; বংশীয় মানমর্যাদা বা বাহাদুরী প্রকাশের জন্যে নয়।"

ভাবনাটি অদ্ভুত। ভট্টাচার্য পদবি ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্য পাঠক ও সমালোচকদের প্রভাবিত করা। বোঝা যায় বইয়ের ভিতরে আখ্যা পত্রটিতে বন্ধনীযুক্ত 'প্রধান পুরোহিত' শব্দ দু'টি রাখা অছে। ওই বইয়ের লক্ষ্য বাংলার হিন্দু সমাজ এবং নব্য মুসলমান গোষ্ঠী। আবুল হোসেন নব্য মুসলমানদের 'নও মুসলিম' বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী। আগ্রায় 'নও-মুসলিম তাবলীগ জামাত'-এর কথা তিনি জানতেন। নব্য দীক্ষিতরা যাতে হিন্দুধর্মে ফিরে না যায় সেজন্য এই সংগঠন। অবশ্য সংগঠক হিসাবে খুব সার্থক নন আবুল হোসেন। তিনি কুচক্রী, স্বার্থপর, ধূর্ত আর অবশ্যই লোভী।

১৯৪৬-এর শেষ দিকে মালদহ শহরে সরকারি দপ্তরে পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার হিসাবে চাকরি পান আবুল হোসেন। তদানীন্তন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সাহেদ সোহরাবর্দির ভূমিকা এই চাকরি প্রাপ্তির পিছনে কাজ

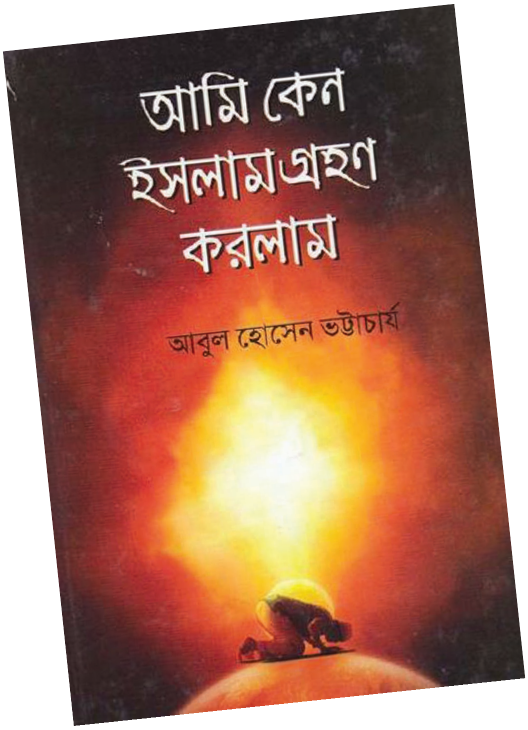

করে থাকবে। ইতিমধ্যে কলকাতায় বিশ্বের অন্যতম ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' সংঘঠিত হয়েছে। সোহরাবর্দির ভূমিকা সেই দিনটিতে কি ছিল তা ইতিহাস পাঠক জানেন। বইটির ১৭৫ পৃষ্ঠার কোথাও লেখক কলকাতার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একটি শব্দও ব্যয় করেননি। তবে সোহরাবর্দির বাড়িতে আবুল হোসেনের আসা যাওয়া ছিল।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট সহসা খবর এল মালদহ জেলা পাকিস্তানের অন্তর্গত। আরও জানা গেল র‍্যাডক্লিফ ঘোষণা অনুসারে জেলার পনেরটি থানার মধ্যে শহর মালদহ ছাড়া দশটি থানা ভারতের অন্তর্গত হবে। কোর্ট চত্বরে ওড়ানো পাকিস্তানের পতাকা নামানো হলো— উড়ল ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা। এ ঘটনায় বড়ই বিমর্ষ হলেন আবুল হোসেন। কারণ এখন তিনি সরকারি চাকরি করতে করতে 'গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচারের কাজ', যাতে তিনি 'মালদহের ধর্মভীরু মুসলমানদের যথেষ্ট সহযোগিতা' পেয়েছেন— তা আর সম্ভব হবে না। আবুল হোসেন তখন একটি বড় কাজ করলেন। পাবলিক রিলেশনস্ দপ্তরের অধিকারে ছিল 'সিনেমা ইউনিট'। 'ইউনিটের মালগুলোর মূল্য ছিল অন্ততপক্ষে দুই লক্ষ টাকা।' আবুল হোসেনের ইসলামি চুক্তিতে এই ইউনিটের মাল পাকিস্তানের প্রাপ্য। যেহেতু মালদহ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত বলে ঘোষিত হয়েছিল। গোপনে গোপনে আবুল হোসেন নৌকায় করে ইউনিটটি পাঠিয়ে দেন নবাবগঞ্জ থানায়। একটি তালিকায় অনুলিপি পাঠিয়ে দেন ঢাকায়। গোটা দেশে যখন দাঙ্গা ও উদ্বাস্তুস্রোত আছড়ে পড়ছে তখন এইরকম ষড়যন্ত্র ইসলামি ঈমান বলেই গণ্য করতে হচ্ছে। তবে একাজে হোসেনকে কেউ কেউ সাহায্য করেছিলেন নিশ্চয়ই। তারা মালদহের ধর্মভীরু মুসলমান ছিলেন। তবে তারা কি ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হবার যোগ্য?

সিনেমা ইউনিটটির জন্য আবুল হোসেনকে জবাবদিহি করতে হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি Last Pay Certificate ছাড়াই রাজশাহীতে চাকরিতে যোগ দেবার চেষ্টা করেন। প্রথম দিকে সম্ভব হয়নি। মালদহে তাঁর নামে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। সে খবর তাঁর কাছে ফাঁস করে দেন কেরানি নূর মোহাম্মদ। হোটেলে মালপত্র ফেলে টুপি গুটিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে, পাজামাটা টেনে গ্রাম্য চাষিদের মতো উঁচু করে ট্রেন ধরে পালান এই বীর চরিত্রবান মুসলমান ভদ্রলোক। রাজশাহীতে সব খবর না

গেলেও কিছু খবর নিশ্চয় ছিল। এবার আবুল হোসেন গেলেন ঢাকা। সেখানে চোরাই করে পাঠানো মালের তালিকার জোরে চাকরিতে বহাল হলেন হোসেন সাহেব।

পাকিস্তান পবিত্রভূমি— ইসলামের আদর্শ বাসস্থান। এই ছিল আবুল হোসেনের বিশ্বাস। মাওলানা মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ-র সঙ্গে আলোচনা সূত্রে তিনি বোঝেন 'রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কুর আনের আইন চালু না হওয়া পর্যন্ত... সত্যিকারের ইসলামি জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়।' সেই কাজটি করার জন্য চেষ্টা করে গেলেন আবুল হোসেন। একাজে তাঁর মন বার বার ধাক্কা খেয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে আততায়ীর হাতে মৃত্যু হলো পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের। জিন্না সাহেবও আবুল হোসেনের ভাষায় 'উলটা-পালটা' কথা বলতে থাকেন। বলেছেন 'প্রদেশের হিন্দু হিন্দু নয়, মুসলমানও মুসলমান নয়; এখন আমরা সবাই পাকিস্তানি।' আদর্শ পাকিস্তান এমন হবার কথা নয় — আবুল হোসেন স্পষ্ট বোঝেন— 'ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ইসলাম সমর্থন করে না— করতে পারে না।'

কিছুদিন কাটল। আবুল হোসেন প্রত্যক্ষ করলেন স্বাধীনতা ঘোষণা করছে বাংলাদেশ। বড়ই আতান্তরে পড়লেন তিনি। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচার থেকে তথাকথিত মুক্তিলাভের লক্ষ্যে বাংলাদেশে তখন 'নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখাই হলো আমাদের জাতীয়তার মূল ভিত্তি।' এ অবস্থায় গোপনে গোপনে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আক্রমণ করা ছাড়া আবুল হোসেনের মতো মুসলমানের কী আর কর্তব্য থাকতে পারে! বলতে থাকলেন তিনি— 'এদেশের শতকরা নব্বইজন অধিবাসীর উপরে' 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' 'শাসন-ব্যবস্থা' কাম্য নয়।

ক্রমে বাংলাদেশে 'হিন্দুদের মূর্তি পূজার সাথে' সংশ্লিষ্ট 'অর্ঘ্য, অঞ্জলি, আলপনা, লগ্ন, লক্ষ্মী, বেদী, বর্ষবরণ, বর্ষাবরণ' দেখে তাঁর মনকষ্ট বেড়েছে। 'শ্যামা-নৃত্য, বাউল সঙ্গীত'কে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলে ধরতে তাঁর মনে সায় ছিল না। অথচ তাই চলেছে সর্বত্র। পাকিস্তান আন্দোলনের এই পরিণতি তিনি কখনো কল্পনা করেননি। হায়দরাবাদ-জুনাগড়-মানভাদার প্রভৃতি পাকিস্তানে না আনতে পারার ব্যর্থতা— বাংলাদেশ হবার পর বহুগুণ বেদনাবহ হয়ে উঠেছিল। আবুল হোসেন বুঝেছিলেন তাঁর সাধের পাকিস্তান তাঁর কাছ থেকে দূরেই সরে যাচ্ছে।

আবুল হোসেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নানা জলসা জমায়েতে বইপত্র বিক্রি করতেন। সঙ্গে থাকত বক্তৃতার ব্যবস্থা। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল উগ্র ইসলাম ধর্ম প্রচার। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের ছলে-বলে-কৌশলে ইসলাম ধর্মে আনা। তিনি প্রচার করতেন হিন্দুধর্মের জাতিভেদের কদর্যতা তাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছে। এই ব্যাপারে একটি প্রবল ধাক্কা খেয়েছিলেন আবুল হোসেন। গাইবান্ধার এক উকিলের বৈঠকখানায় একটি ঝগড়া বিবাদের মোকদ্দমার প্রস্তুতি চলছিল। আবুল হোসেন দেখলেন মামলাকারী একজন হানাফী মুসলমান। অভিযোগ একজন মুহাম্মদি বা রফাদানীর বিরুদ্ধে। হাটের মসজিদে শুরু করার সময় একে অন্যের খুঁত ধরে। তাই ঘোর গণ্ডগোল বাধে। ওই উকিল আবুল হোসেনকে প্রশ্ন করেন— হিন্দুদের জাতিভেদ অসহ্য হওয়ায় তিনি নাকি মুসলমান হয়েছেন? এখন কি বলবেন? তখন ইংরেজ শাসন। উপস্থিত মুসলমানরাই তাঁকে থামিয়ে দেয়। জন্মের পর থেকেই হানাফী আর রফাদানীর মধ্যে বিরোধ তারা দেখে আসছে। আবুল হোসেন বোঝেন তত্ত্বে যাই হোক মুসলমানদের মধ্যে প্রবল ভেদাভেদ বিদ্যমান। হানাফী-মুহাম্মদী, শিয়া-সুন্নী, ওহাবী- আওহাবী, খারেজী-মুতাজিলা— বহু ভাগ। এসবের দিকে সারাজীবন চোখ বুঁজে থেকে আবুল হোসেন তাঁর ধর্মব্যাপী জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৮৩ সালে। উক্ত গ্রন্থে একটি বিপজ্জনক অংশ আছে। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে সেখানে। 'ওমা! তোর চরণেতে দিলাম মাথা পেতে।' —এই পংক্তি তাঁর মতে 'তৌহিদবাদী মুসলমানদের' পক্ষে মেনে নেওয়া যায় না। চরণে মাথাপেতে দেওয়ার অর্থ 'প্রণিপাত' বা 'সেজদা'— যা ইসলামের দৃষ্টিতে অংশীবাদিতা অর্থাৎ অমার্জনীয় অপরাধ। তাঁর যুক্তি, জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা 'ঈমানের অঙ্গ', কিন্তু আল্লার প্রতি একান্ত নির্ভরতাও জরুরি। তাই তাঁর 'বিনীত অনুরোধ' 'বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী তৌহিদবাদী মুসলমানকে দেশমাতৃকার চরণে প্রণিপাত করার এই জঘন্য পাপ থেকে রক্ষা করুন।' লেখাটির কোথাও রবীন্দ্রনাথের নাম নেই। বোঝা যায় কী তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ মনে মনে পোষণ করতেন এই মওলানা।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এই বিভ্রান্ত, কুচক্রী, দুষ্টস্বভাব মানুষের ভালো লাগার কথা নয়। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার সামান্যতম সম্ভাবনাও তাঁর পক্ষে সমালোচনার বস্তু। আর তবু, সর্বশক্তিমান আল্লার গজব —বাংলাদেশ হয়েছে। আবুল হোসেনের মর্মবেদনা হয়েছে সীমাহীন। লক্ষ্য করলেন তিনি তাঁর কল্পনার পাকিস্তান— 'পৃথিবীর সকল মানুষের আদর্শ ও অনুসরণীয়' থাকতে পারল না। বিজয়ী ভারতীয় হিন্দুরা 'সেই রাষ্ট্রের রক্ষক এবং বীর মজাহিদ'-দের 'লক্ষাধিক মানুষকে চরমভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত' করে 'যুদ্ধবন্দী হিসেবে বেঁধে ভারতে নিয়ে গেলো'। মওলানা সাহেবের দেওয়া অঙ্কটিতে সামান্য ভুল আছে। লক্ষাধিক নয়— তিরানব্বই হাজার।

যে-কোনো মানুষ যে-কোনো ধর্মে বিশ্বাস করতে পারেন। তাঁকে বাধা দেওয়া অনুচিত। কিন্তু এই আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের বইখানা যদি বাংলাদেশে প্রচারিত হোত তাহলে আমাদের বিশেষ কিছু বলার থাকত না। বইটি ৫৫, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩-এ ইকরা প্রকাশনী থেকে জনৈক এ. এস. মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত, ISBN-81-7999-094 যুক্ত। ২০০০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত তিনটি মুদ্রণ হয়ে গেছে। তসলিমা নাসরিনকে আমরা কলকাতায় থাকতে দিইনি। তাঁর বইয়ের অংশ বিশেষ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। আর বন্ধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত আর তাদের উপর অত্যাচারকারী সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে এমন দেশ-বিরোধী কথা বলার পরও তাঁর বই আমাদের দেশে ছাপাই- বাঁধাই-প্রকাশ-বিপণন হচ্ছে! যে দেশদ্রোহী দেশের সম্পদ চুরি করেছে, দেশ বিরোধী অত্যাচারী পাক সেনাদের 'বীর মুজাহিদ' বলতে যার কলম অকম্পিত, তাঁর বই আমরা অবিরোধে প্রচার করে চলেছি! ধন্য আমাদের রাজনীতি, ধন্য আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা। ■

থাকে যদি
'ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
DUTA
TURMERIC
POWDER
50g
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
CHILLI
POWDER
Kasuri Methi
pure
INDIAN
SPICES
Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

অন্য রকম

মিলখা সিংয়ের সঙ্গে চন্নদীপ সিং।

হার-না-মানা চন্নদীপ সিংহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংগ্রামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সাফল্য। লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে অনেক ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এবং তারপরই সাফল্য প্রাপ্তি। এরকমই এক কিশোর শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই কিশোরের দু'টি হাত ছোটবেলায় কাটা গেছে। শুধু পা দু'টিকে কাজে লাগিয়ে বাস্তবের মাটিতে এবং সাফল্যের সিঁড়িতে চড়তে সক্ষম হয়েছে চন্নদীপ সিংহ।

জম্মু এবং কাশ্মীরের চান্নিরাম এলাকায় গুরু তেগবাহাদুর নগরের এক ছোট্ট বাড়িতে বাবা-মা ও এক দিদি-র সঙ্গে থাকে চন্নদীপ। শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারটির একমাত্র রোজগেরে তার বাবা সুরিন্দর সিং। সরকারি কর্মচারী। এই পরিবার বেশ সুখেই দিনযাপন করছিল এতদিন। কিন্তু বিপত্তি ঘটে ২০১১ সালে। বিকেল বেলায় বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলছিল চন্নদীপ। মাঠের পাশ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের হাইটেনশন লাইনের তারে চন্নদীপের হাত ঠেকা মাত্রই আটকে পড়ে। এরপর সে বাঁ-হাত দিয়ে তা ছাড়াবার চেষ্টা করলে দু'হাতই আটকে যায়। স্থানীয় লোকজনের সাহায্যে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অস্ত্রোপচারে তার হাত দুটি বাদ পড়ে। লুধিয়ানার ডিএমসি হাসপাতালে বেশকিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর হাতহীন চন্নদীপ বাড়ি ফিরে আসে।

শৈশব থেকেই চন্নদীপের ইচ্ছা ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে। সেই মতো সে নিজেকে গড়ে তুলছিল। কিন্তু আচমকা এই বিপত্তিতে তা স্বপ্নই থেকে যায়। তবে ছোট থেকে ফুটবলের প্রতি টান ছিল চন্নদীপের। এছাড়াও এলাকায় খুদে ফুটবল তারকা হিসেবে লোকে চন্নদীপকে চিনত। অনেকগুলি ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলে বেশ কয়েকটি পুরস্কারও তার দখলে। ১৪ বছর বয়সে হাত খোয়ালেও মাঠের প্রতি টান তার একটুও কমেনি। ফুটবল ছেড়ে বর্তমানে সে রোলার স্কেটিং খেলোয়াড়। যার ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

বর্তমানে জম্মুর জীবননগরের বায়নিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র চন্নদীপ। খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশোনাতেও তুখোড়। দুর্ঘটনায় দুটি হাত চলে যাওয়ায় পড়াশুনা থেকে পিছিয়ে পড়েনি চন্নদীপ। বরং প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে পড়াশোনাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পা দিয়েই বইয়ের পাতা ওলটানো, লেখা বা ল্যাপটপে কাজ করে সে। এই অসুবিধা আঁচ করে ডিএমএস হাসপাতালের চিকিৎসকরা চন্নদীপের দেহে কৃত্রিম হাত প্রতিস্থাপনের কথা বলেন। যার মাধ্যমে চন্নদীপ কাজ করতে পারবে বলেও তারা জানায়। কিন্তু তার জন্য সামান্য সরকারি চাকুরে সুরিন্দর সিংহের পক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। কারণ এই কৃত্রিম হাত ভারতে পাওয়া যায় না। এরজন্যে আমেরিকা থেকে হাত আনাতে হবে। চন্নদীপের পরিবার অর্থনৈতিক অক্ষমতার কথা স্বীকার করে কৃত্রিম হাত প্রতিস্থাপনের বিষয় থেকে পিছিয়ে আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পিছিয়ে যায়নি জম্মু-কাশ্মীরর স্কেটিং বয়। তাঁর কথায়, ‘‘আমার হাত না থাকাতেও আমি রোলার স্কেটিং-য়ের চৌহদ্দির মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক চলতে পারি। আগে আমি ফুটবল খেলতাম কিন্তু হাত চলে যাওয়ার পর রোলার স্কেটিং খেলি। এক্ষেত্রে আমার বাবা-মা ও বোন খুবই উৎসাহ জোগায় এবং আমার খেলার ক্ষেত্রে তারা খুব সাহায্যও করে।’’ বর্তমানে চন্নদীপ একজন জাতীয় স্তরের স্কেটার।

উত্তরখণ্ডের মুসৌরিতে ৭ম অল ইন্ডিয়া রোলার স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপে চন্নদীপ ব্রোঞ্জ জেতে। এছাড়াও ২০১২ সালের আগস্টে শাহোগ ইন্ডিয়া সংস্থার উদ্যোগে স্কেটিং প্রতিযোগিতায় সোনা জেতে। পাশাপাশি স্কেটিং-য়ের অন্যান্য প্রতিযোগিতাতেও তার কৃতিত্ব অসামান্য। চন্নদীপ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বলেন, ‘তুমি আমাদের বিশেষ কাছের একজন। তুমি শুধু তোমার পরিবারের নও, সারাদেশের।’ চন্নদীপ সম্প্রতি ‘উড়ন্ত শিখ’ মিলখা সিং-য়ের সঙ্গে দেখা করে। সাহায্যের জন্য আবেদন করলে তিনি সর্বতোভাবে তা করার আশ্বাস দেন। মিলখা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে যাতে হাত দুটি কম পয়সায় প্রতিস্থাপন করা যায় তারও আশ্বাস দেন। মিলখা সিংহের ইচ্ছা, চন্নদীপ ভবিষ্যতে বিশ্বের দরবারে রোলার স্কেটিং-য়ে ভারতের উপস্থিতি প্রমাণ করতে পারে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

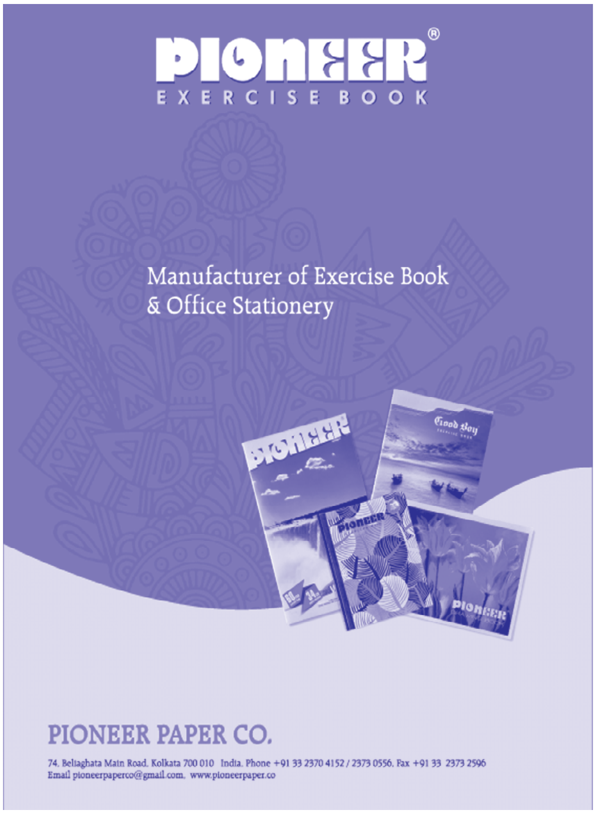

" কেবল পড়তে বা লিখতে জানাই শিক্ষা নয়। এই দুটি গুণকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা অর্জন করা বেশি প্রয়োজন। যে নারীর হৃদয়ে সহানুভূতি জাগ্রত হয়েছে, নিজ জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান আছে, তিনি ভারতের মহান তীর্থগুলির কয়েকটি অন্তত পরিভ্রমণ করেছেন, নিজ দেশ সম্পর্কে কিছু ভৌগোলিক জ্ঞান যাঁর অধিগত, তিনি বহুশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতদের অপেক্ষা যথার্থ ও গভীরভাবে শিক্ষিত। "

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

মহর্ষি পতঞ্জলির প্রতিমূর্তি।

শরীর-মন-বুদ্ধির বিকাশের জন্য চাই যোগাভ্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গত বছর ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংযুক্ত অধিবেশনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ওই প্রস্তাব অভূতপূর্ব সমর্থন পেয়েছিল। নেপাল তৎক্ষণাৎ সমর্থন করে, ১৭৫টি সদস্য দেশও প্রস্তাবের পক্ষ অবলম্বন করে। অত্যন্ত কম সময়ে মাত্র ৯০ দিনের মধ্যেই ১১ ডিসেম্বর (২০১৪) ভোটাভুটি ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে যোগদিবস পালনের প্রস্তাব রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

'যোগ' বিশ্বসভ্যতায় ভারতের অমূল্য অবদান। সংস্কৃত যুজ্ ধাতু থেকে সৃষ্ট 'যোগ' শব্দের অর্থ যুক্ত করা এবং যোগের শেষ পর্যায় 'সমাধি' হলো সাধনার সর্বোচ্চ অবস্থা। 'যোগ' কেবল শারীরিক ব্যায়াম মাত্র নয়, মহর্ষি পতঞ্জলির কথায় 'যোগ' শরীর-মন-বুদ্ধি-আত্মা-র সংযোগ সাধনকারী জীবনযাপনের পদ্ধতি। শাস্ত্রে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ', মনঃ প্রশমনোপায়ঃ যোগঃ' এবং 'সমত্বং যোগঃ উচ্যতে'—প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। এই 'যোগ' অনুসরণ করে ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ ও নিরাময় জীবনযাপন করতে পারেন। 'যোগ' অনুসরণকারী ব্যক্তি প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করে থাকে। দিন প্রতিদিন 'যোগ' অনুসরণ করে শান্তিপূর্ণ ও নিরাময় জীবনযাপনে প্রয়াসরত মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

আমরা সকলেও এই যোগ অভ্যাস করতে পারি। কেমন করে কি কি যোগ অভ্যাস করতে হবে তার একটা রূপরেক্ষা নীচে দেওয়া হলো :

সিদ্ধতা : শতরঞ্চি বা কম্বল পেতে সুখাসন (হাঁটু মুড়ে বা অর্ধ পদ্মাসনে মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে হবে। তিনবার ওঙ্কার ধ্বনি করে আনুমানিক ১০ সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে তার অনুরণন অনুভব করতে হবে।

শ্লোক পাঠ :

যোগেন চিত্তস্য, পদেন বাচাং, মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।

যোঽপাকরোত্তং প্রবরং মুনিনাং, পতঞ্জলি প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি।

অর্থাৎ-যোগের দ্বারা চিত্তের মল, ব্যাকরণের দ্বারা বাণী বা বাক্যের মল এবং বৈদ্যকীয় শাস্ত্রের সাহায্যে শরীরের মল নষ্ট

করে দেওয়ার যিনি স্রষ্টা সেই মুনিবর পতঞ্জলিকে প্রণাম জানাই।

যোগাসন : তাড়াসন, উৎকটাসন, উৎকটাসন, ত্রিকোণাসন, পার্শ্বকোণাসন, উত্তানাসন।

মুদ্রা :

১. জ্ঞানমুদ্রা : তর্জনী দিয়ে বুড়ো আঙ্গুলকে স্পর্শ করতে হবে, বাকি তিন আঙ্গুল সোজা রাখতে হবে।

ফল : একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়, ক্রোধ নিয়ন্ত্রিত হয়, ভাল ঘুম হয়।

অভ্যাসের সময় কাল ঃ প্রত্যহ ৪৫ মিনিট।

২. পৃথ্বীমুদ্রা : অনামিকাকে বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে লাগিয়ে বাকি তিনটি আঙ্গুলকে সোজা রাখতে হবে।

ফল : এতে হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পুষ্টি (metabolism) প্রক্রিয়া ঠিক না হওয়ার জন্য শিশুরা ভোজন করলেও দুর্বল হয়ে যায়। এই মুদ্রা প্রত্যহ করলে এইসব সমস্যা দূর হয় সেই সঙ্গে ভিটামিন ও প্রোটিনের অভাব হয় না।

অভ্যাসের সময় কাল : প্রত্যহ ৩০ মিনিট।

৩। ইন্দ্রমুদ্রা : কনিষ্ঠাকে বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে লাগিয়ে, বাকি তিনটি আঙ্গুল সোজা করে রাখা।

ফল : এর ফলে জলতত্ত্বের ভারসাম্য রক্ষিত হয় অর্থাৎ শরীরের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গৃহীত হয়। শরীরের জলতত্ত্ব বেশি হলে কোনো অঙ্গ ফুলে যেতে পারে। এই মুদ্রা করলে ফোলা ভাব কম হয়। জলতত্ত্ব কম হলে ব্রণ, দাদ, হাজা, চুলকানি, সোরাসিস, একজিমা হতে পারে। এই মুদ্রাতে এইসব রোগের ক্ষেত্রে উপকার হয়।

৪. প্রাণমুদ্রা : কনিষ্ঠা ও অনামিকার অগ্রভাগ দিয়ে বুড়ো আঙ্গুলের অগ্রভাগকে স্পর্শ করে বাকি দু'টি আঙ্গুলকে সোজা রাখতে হবে।

ফল-১ : প্রাণবায়ু হৃদয় থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত চলাফেরা করে তাই এই মুদ্রা অভ্যাস করলে হৃদয় থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত সব রোগ দূর হয়ে যায়। শারীরিক দুর্বলতা দূর হয়।

ফল-২ : এই মুদ্রা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। জীবনীশক্তি বাড়িয়ে দেয়। ভিটামিন ও প্রোটিনের অভাব দূর হয়। চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

ফল-৩ : সব প্রকারের ফ্লু (সোয়াইন), ডেঙ্গু ইত্যাদি ক্ষেত্রে লাভজনক হয়।

অভ্যাসের সময় কাল : প্রত্যহ ৩০-৪৫ মিনিট।

৫. মৃত সঞ্জীবনী/অপানবায়ু মুদ্রা :

নিয়ম : তর্জনীকে ভাঁজ করে আঙ্গুলের গোড়ায় স্পর্শ করে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিতে হবে (বায়ুমুদ্রা), সেই সঙ্গে মধ্যমা এবং অনামিকাকে বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে মিলিয়ে কনিষ্ঠা সোজা রাখতে হবে। (অপান মুদ্রা)।

ফল-১ : এই মুদ্রা হৃদরোগের (Heart Attack) জন্য খুবই লাভজনক। হৃদরোগ হলে এই মুদ্রা করার সঙ্গে সঙ্গে দুই মিনিটে উপশম হয়।

ফল-২ : হৃদস্পন্দন কম বা বেশি হলেও এই মুদ্রা খুবই লাভদায়ী।

ফল-৩ : বুকে ব্যথা (Angina Pectoris), উচ্চ রক্তচাপ এবং নিম্ন রক্তচাপেরও এটি লাভ দেয়।

অভ্যাসের সময় কাল : ১৫ মিনিট।

প্রাণায়াম : ভস্ত্রিকা, কপালভাতি, বিভাগীয় শ্বসন, নাড়ী শোধন (অনুলোম-বিলোম)

সঙ্কল্প : আমি...সৌভাগ্যবান যে আমার জন্ম ভারতবর্ষের মতো পুণ্যভূমিতে হয়েছে। যে দেশে জন্ম নেওয়ার জন্য দেবতারাও উদগ্রীব হয়ে থাকেন। মাতৃভূমিকে আবার বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজে ব্যক্তিগতভাবে যোগভিত্তিক জীবনযাত্রা গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করছি। ভারতমাতা কী জয়।

ধ্যান : ৫ মিনিট শ্বাসের উপর লক্ষ্য রেখে ভ্রূ-যুগলের মধ্যে মনস্থির করে সঙ্কল্পের চিন্তা করা।

কল্যাণ মন্ত্র :

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরামায়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগভবেৎ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমারোপ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ২০ দিন ধরে চলা দক্ষিণবঙ্গের ছাত্র- স্বয়ংসেবকদের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান গত ২৭ মে হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকরা বিভিন্ন শারীরিক কলাকৌশল প্রদর্শন করে। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণবঙ্গের উপার্জনশীল স্বয়ংসেবকদের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের সমাপ্তি হয় গত ৬ জুন মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজার লাথুরাম তোষনিওয়াল সরস্বতী শিশুমন্দিরে। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র কার্যকারিণীর সদস্য সত্যনারায়ণ মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। দুই বঙ্গের মিলিত বিশেষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় গত ৬ জুন মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। উল্লেখ্য, এখানে ৪০ বছরের বেশি বয়সী স্বয়ংসেবকরা অংশগ্রহণ করেছিল। গত ৩০ মে পূর্ব ক্ষেত্রের দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় ওড়িশার অনুগুল শহরে সরস্বতী বিদ্যামন্দিরে। মঞ্চে বর্গের সর্বাধিকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগের সহ-সঙ্ঘচালক সুভাষচন্দ্র নন্দী, প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন পূর্বক্ষেত্রে কার্যবাহ গোপালপ্রসাদ মহাপাত্র এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ওড়িশার আদিত্যবাহিনীর জাতীয় অধ্যক্ষ হেমন্ত দাস। উত্তরবঙ্গের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি কার্যক্রম হয় শিলিগুড়ির অদূরে নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দিরে। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহীকুমার সরকার।

মঙ্গলনিধি

সমাজ সেবা ভারতীর বাণপ্রস্থী কার্যকর্তা অসিত চট্টোপাধ্যায়ের বড়দা অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর পৌত্র শ্রীমান শুভমের উপনয়ন উপলক্ষে গত ৩১ মে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উঃ ২৪ পরগনা বিভাগ কার্যবাহ কাজল শিকদারের হাতে।

শোকসংবাদ

প্রয়াত হলেন দীর্ঘদিনের পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা মিলন

বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ রোগভোগের পর তিনি গত ১৯ মে পরলোকগমন করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে কলকাতার বেহালায় জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশুনা শেষ করে ১৯৯৩ সালে কল্যাণ আশ্রমের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও শিলিগুড়িতে কাজ করেছেন। নাগাপ্রদেশেও তিনি কিছুদিন কাজ করেন। ২০০৭ থেকে শেষ অবধি তিনি পাঞ্জাব প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক হিসেবে কার্যরত

ছিলেন। গত ২৪ মে দিল্লীতে তাঁর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কলকাতা থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক তথা কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তা গজানন বাপট শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঈশ্বরের কাছে আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

***

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চম্পাহাটির স্বয়ংসেবক ভাস্কর চ্যাটার্জির পিতৃদেব গোলকনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ২১ মে শিয়ালদহের বি আর সিং হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। তিনি অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী ছিলেন। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, ২ পুত্র এবং নাতি-নাতনিদের।

***

মালদা জেলার সাহাপুরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সন্তোষ শুকুল গত ২২ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ২ পুত্র, ৫ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর দুই পুত্রই স্বয়ংসেবক।

'শ্রদ্ধা'র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ৩১ মে শুভ জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন বীরভূম জেলার লম্বোদরপুর গ্রামের ৯৪ বৎসর বয়স্কা একাদশ সন্তানের জননী অনিমা রায়কে 'শ্রদ্ধা'র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। 'ওঙ্কার ধ্বনি ও মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গ্রামের প্রবীণ স্বয়ংসেবক দুঃখহরণ দাস। মাকে ৯৪টি পদ্মফুলের মালা নিজ হতে তৈরি করে পরান 'শ্রদ্ধা'র সভাপতি নিরঞ্জন হালদার (ছোটদা)। অনিমা দেবীর এগারো জন সন্তানের মধ্যে আটজন দেশ রক্ষার কাজে ব্রতী ছিলেন বা আছেন। পুত্ররা মায়ের ইচ্ছানুসারে দেশের আরক্ষা বাহিনীতে চাকুরিরত হন। অনুষ্ঠানে পুত্রদের মধ্যে চারজন উপস্থিত ছিলেন। সন্তানরা সবাই লম্বোদরপুর শাখার স্বয়ংসেবক। অনিমাদেবীকে পূজা ও আরতি করেন, তাঁর বড়বৌমা ও 'শ্রদ্ধা'র পক্ষে শুভ্রা ঘোষ। তাঁকে নামাবলী, বস্ত্র, শ্রীগীতা, ফল ও মিষ্টান্ন অর্ঘ্য স্বরূপ প্রদান করা হয়। 'শ্রদ্ধা'র পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক। অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন সিউড়ি বেণীমাধব বিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য মহাশয়।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিক্ষা বর্গ প্রবেশ-প্রবোধ

গত ২৫ মে থেকে ৯ জুন পর্যন্ত রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিক্ষা বর্গ প্রবেশ ও প্রবোধ হাতিয়াড়া সাবিত্রীদেবী কাজোরিয়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা বর্গে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫৫ জন। এছাড়াও প্রবেশ ও প্রবোধ শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা, অধিকারী মিলিয়ে মোট সংখ্যা ৬৫ জন বর্গে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা বর্গে ১৩টি জেলা থেকে শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। অধিকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্র কার্যবাহিকা মহুয়া ধর, প্রমুখ সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার, প্রান্ত কার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী-সহ অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হলদেকর। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় কার্যালয় প্রমুখ চিত্রাতাঈ যোশী। অধ্যক্ষা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী ভাবনা সঙ্ঘের অন্যতম নেতাজী গবেষক পূরবী রায়।

আমার ‘মা’

সাধনা দে

নারী ভাবীকালের সম্ভাবনা। আর সেই সম্ভাবনা হলো ‘মা’। মায়ের কোনো বিকল্প হয় না। মা-বাবা কেউ বেছে নিতে পারে না, তবে আমরা এমন এক ‘মা’-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি, পৃথিবীর আলো দেখেছি, তিনি অনন্যা।

আমার মা ছিলেন সাহসী ও বুদ্ধিমতী। দাদুর কাছে গল্প শোনা যে, ছোটবেলায় মা ছোরাখেলায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুকে পরাস্ত করে মেডেল লাভ করেন। তিনি যখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী সেইসময় রামায়ণ ও মহাভারত বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সূচীশিল্পেও তিনি ছিলেন অসামান্য পারদর্শী। বই পড়া ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ। আমাদের কাছে ‘মা’ এক দৃষ্টান্ত।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে এক অতি সাধারণ পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে তিনি সংসার প্রতিপালন করেছেন। তিনি ছিলেন সদাহাস্যময়ী, সদালাপী মানুষ। পাড়া প্রতিবেশী সবাই তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। অপরের দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তিনি।

মা দেশকে ভালোবাসতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেশের কাজে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান আমাদের ছোড়দা প্রয়াত দিলীপ আঢ্যও দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত সেবাপ্রমুখ ছিলেন। অন্যান্য সন্তানদেরও সঙ্ঘের কাজে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন। এহেন মায়ের জন্য আমরা গর্ববোধ করি। সঙ্ঘের বহু প্রচারক ও কার্যকতা, যেমন ভূমানন্দ পাল (বাচ্চুদা), বসন্তরাও ভট্ট, মধুকর মালসে, বিদ্যুৎ দত্ত, গৌরাঙ্গ দাশগুপ্ত, রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, অনন্তলাল সোনী, দীপেন দে, দীনেন দে, শিবদাস বিশ্বাস, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, জ্যোতিষ ভট্টাচার্য, মানিক ভট্টাচার্য, দিলীপ ঘোষ, বলরামদাস রায় প্রমুখ মায়ের স্নেহ লাভ করেছিলেন। এছাড়া স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা তো ছিলেনই।

এত ভাল হওয়া সত্ত্বেও বিধাতা অলক্ষ্যে থেকে একটু ক্রূর হাসি হেসেছেন। মা দীর্ঘ পাঁচ বছর শয্যাশায়ী হয়ে থেকেছেন। হারিয়েছেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ও বড় জামাতাকে। এতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত ছিলেন।

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে গত ১ মে (বৈশাখ শুক্ল ত্রয়োদশী তিথি) মায়ের দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল একটা পরম্পরা। মায়ের আত্মা শান্তি লাভ করুক। মায়ের আশীর্বাদ পাথেয় করে বাকি জীবনটা যেন সুষ্ঠুভাবে কাটাতে পারি। যদি থাকে পুনর্জন্ম, তবে বারবার এই মায়ের গর্ভেই জন্ম নিতে চাই। ▮

স্বস্তিকা

শ্যামাপ্রসাদ
স্মরণ
সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ৬ জুলাই, ২০১৫

মূল্য : ১০ টাকা

সত্বর কপি বুক করুন

শব্দরূপ-৭৫১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

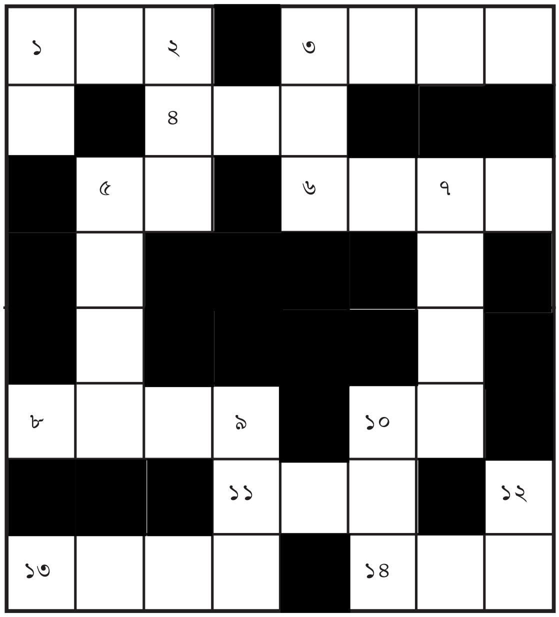

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. ছল, ছুতা, মিথ্যা অজুহাত, **৩.** প্রেতোদ্দিষ্ট-দান গ্রহণকারী পতিত ব্রাহ্মণ, **৪.** সম্ভ্রম, সম্মান, **৫.** '—রে কৃষিকাজ জানো না', **৬.** যখন তখন ডেকে যাকে কাজের ভার দেওয়া যায় এবং সর্বদা আদেশ পালনের জন্য যে কাছেকাছেই থাকে, **৮.** অহংকার, **১০.** দাবা ইত্যাদি খেলায় বিপক্ষের পরাজয় ('বাজি—'), **১১.** শোভাযাত্রা, **১৩.** স্বর্গগঙ্গা, **১৪.** টীকাকরণের মাধ্যমে সম্প্রতি এই রোগটি নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

উপর-নীচ : ১. সম্পত্তি পরিচালক, **২.** ইঙ্গ প্রতিশব্দে রেখা ('—টানা'), **৩.** মদন, কামদেব, **৫.** বহুমূত্ররোগ, **৭.** নায়কের আচরণ প্রীতিকর হলেও বিরক্তির ভান করে নিবারণার্থ হস্তাদি সঞ্চালন, **৯.** রমণী, স্ত্রী; সাদা সুগন্ধি ফুল বিশেষ, **১০.** 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এর সেই বিখ্যাত সংলাপ, 'মাসিমা—খামু', **১২.** নৌকা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৪৮

	হা	ল	খা	তা		নী	লা
বা	ত		ম	ল		ল	
বা	সা			ন		ক	
	ফা		অ	ব	গু	ণ্ঠ	ন
রা	ই			মী	ন		ন্দী
ক		বা					
	গা	ধা	খা	টু	নি		ক
		ই		লি			ঙ্গী

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
অসীম হাজরা
দুর্গাপুর, বর্ধমান

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৫১ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৯ জুন ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ২৮

জেড প্লাস নিরাপত্তা পাচ্ছেন সরসঙ্ঘচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এখন থেকে জেড প্লাস নিরাপত্তা পাবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি বিজ্ঞপ্তিতে এরকমই জানানো হয়েছে। সি আই এস এফ-এর বিশেষ বাহিনী এই দায়িত্ব নিয়েছে। সব সময়ের জন্য ৬০ জন কমান্ডোর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকবেন তিনি। এমনকী নাগপুর সঙ্ঘ কার্যালয় এবং প্রবাসের সময়ও তা জারি থাকবে।২০১৩ সালে সরসঙ্ঘচালকের নিরাপত্তার বিষয়ে এই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। এবার তা কার্যকরী করা হলো। এটিই দেশের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

পঞ্চাশবর্ষ পূর্তিতে ১৯৬৫-র যুদ্ধ জয়ের স্মরণে উৎসবের কথা ভাবছে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের জয়লাভের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্র সরকার সেনাবাহিনীকে এক উৎসবের আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছে। এবছরের ১ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনা ও ভারতীয় বায়ুসেনাকে প্রদর্শনী, ট্যাবলো, শোভাযাত্রা, তথ্যচিত্র, আলোচনা সভার মাধ্যমে এই উৎসব করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৬৫-তে এই সময়েই ওই যুদ্ধ হয়েছিল। রাজধানী দিল্লীর প্রাণকেন্দ্র— রাজপথ, জনপথ এবং ইন্ডিয়া গেটের আশেপাশে এই উৎসবের আয়োজন করতে বলা হয়েছে। উৎসবের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে ১৯৬৫-র যুদ্ধের পর তাসখন্দের আপোশ মীমাংসা বৈঠক নিয়ে বিতর্ক বা আলোচনা। যে যুদ্ধে ভারত জিতেছিল, কিন্তু আলোচনার টেবিলে হেরে যায়। উল্লেখ্য, ওই বৈঠক চলাকালীনই তাসখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ইতিহাস বিভাগ প্রকাশিত '১৯৬৫-র দি ইন্ডিয়ান-পাকিস্তান যুদ্ধ'— শীর্ষক একটি সরকারি তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস (সম্পাদক : এস এন প্রসাদ, সাধারণ সম্পাদক : ইউপিএ থাপলিয়াল)— যার একটি অংশ এখনও প্রকাশিত হয়নি, সেইগুলির পর্যালোচনা হতে পারে। খোদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিক্কর বিষয়টি দেখাশোনা করছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনেকে বিশ্বাস করেন, ১৯৬৬-র জানুয়ারিতে তাসখন্দের মীমাংসা সভায় শ্রী শাস্ত্রী রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হাজিপীর গিরিপথ যা ভারতীয় সেনাবাহিনী দখল করেছিল তা প্রত্যার্পণ করে। ভারতের দিকে এই গিরিপথ উরি ও পুঞ্চের মধ্যে সংযোগসূত্র ছিল যা এখন পাকিস্তানের দখলে। প্রাপ্তসূত্র অনুসারে এই গিরিপথকে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের ভারতে ঢোকাবার কাজে ব্যবহার করছে। সূত্র অনুসারে, ওই যুদ্ধে ভারত ১৯২০ বর্গকিলোমিটার পাকিস্তানের এলাকা দখল করে। অন্যদিকে পাকিস্তান ভারতের ৫৫০ বর্গকিলোমিটার জমি দখল করে। এরপরও পাকিস্তান প্রতিবছর ৭ সেপ্টেম্বর 'বিজয় দিবস' পালন করে আসছে। সরকারি ইতিহাসের যে অংশটা এখনও অপ্রকাশিত সেখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তৎকালীন পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ভেবেছিলেন ১৯৬২-র চীনা আক্রমণে পর্যুদস্ত ভারত এখন দুর্বল। এই সুযোগে কাশ্মীরকে বলপূর্বক পাকিস্তানের দখলে নিয়ে নেওয়া যাক। যদিও বাস্তবে তা ঘটেনি বরং পাকিস্তানকেই পিছু হটতে হয়েছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ-এর উদ্যোগে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গবেষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'দ্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ' (আই সি এইচ আর) খুব শীঘ্রই সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গবেষণার কাজ শুরু করতে চলেছে। গবেষণার উদ্দেশ্যে মূলত কিছু ভ্রান্ত ধারণার অবসান করা। যেমন, ভারতে আর্য আগমন তত্ত্বের মনগড়া বিষয়গুলির সত্যাসত্য নিরুপণ করা। আই সি এইচ আর মূলত ভারতের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বশাসিত সংস্থা। গত ২৮-২৯ এপ্রিল এই বৈঠকে সংস্থার চেয়ারপার্সন ইউ সুদর্শনরাও এক প্রস্তাব পাঠ করেন। তাতে তিনি জানান, গবেষণার জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ভিত্তিক বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গেছে, যার দ্বারা আর্য আগমনতত্ত্ব বিষয়েরও ভ্রান্তি নিরসন করা যাবে। প্রাপ্ত সূত্রে খবর, কমিটির বৈঠকে সেক্রেটারি গোপীনাথ রবীন্দ্রন-সহ আটজন সদস্যের সহমতের ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতের নতুন ইতিহাস গবেষণার কাজে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে।

আমেরিকায় সবচেয়ে শিক্ষিত হিন্দুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আমেরিকায় হিন্দুসংখ্যা বাড়ছে। এখন প্রায় ২২.৩ লক্ষ হিন্দু বসবাস করছে আমেরিকায়। বড় কথা হলো, আমেরিকায় সবচেয়ে শিক্ষিত এখন হিন্দুরাই। পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক সমীক্ষা অনুসারে আমেরিকার হিন্দুজনসংখ্যা ০.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে এখন ০.৭ শতাংশ হয়েছে। ২০০৭ সালে আমেরিকায় ১২ লক্ষ হিন্দু ছিল, ২০১৪ সালে তা ২২.৩ লক্ষ হয়েছে। আমেরিকার মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩০.১ কোটি। পিউ রিসার্চ সেন্টারের মতে, ২০৫০ নাগাদ হিন্দুদের সংখ্যা ৪০.৭৮ লক্ষ হয়ে যাবে, যা আমেরিকার জনসংখ্যার ১.২ শতাংশ। আমেরিকায় এখন ৭৭ শতাংশ হিন্দু উচ্চ শিক্ষিত। ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
15 June - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা